সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৩৩-৩৪
বার : সোমবার

২২ মে- ২০২৩ ঈসায়ী
০৮ জ্যৈষ্ঠ- ১৪৩০ বাংলা
০১ জিলক্বদ- ১৪৪৪ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম স্থাপনা**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- ☐ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৭
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **পবিত্র হজ্জ : সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত**
    মোহাম্মদ আব্দুল জলিল খান- ০৮
  - ❖ **ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ**
    শাইখ মুহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)- ১৩
  - ❖ **কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার**
    এস. এম আব্দুর রউফ- ১৮
- ✍ **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **প্রফেসর ড. এম এ বারী (রহিমাহুল্লাহ) ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ২৩
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **আল্লাহর উপর ভরসাকারী জনৈক মহিলা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৭
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২৮
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক**
    মো. আরিফুর রহমান- ৩১
- ✍ **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - ❖ **কায়রো : ইসলামী ঐতিহ্যের নিদর্শন**
    আল আমীন বিন সুরুজ- ৩৪
- ☐ **পরামর্শ :**
  - ❖ **হজ্জের জন্য নিজকে প্রস্তুত করুন**
    আরাফাত ডেস্ক- ৩৫
- ✍ **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **পাহাড়ের গুহায় বিপদগ্রস্ত তিন ব্যক্তি**
    আবু তাসনীম- ৩৭
- ✍ **কবিতা** ৩৮
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- ✍ **শুব্বান সংবাদ** ৪০
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪১
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- ✍ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

বিবেকের দর্পণ

মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ। তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে আধুনিক জীবনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। পাতালপুরীর অজানা কাহিনিকে পেছনে ফেলে নিত্য-নতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠছে। জল-স্থল ও মহাশূন্যে বিচরণ এখন নেহায়েত মামুলি ব্যাপার। অকুতোভয় সেনানীর মতো জগৎপানে মানুষ অগ্রসরমান। জাগতিক উন্নয়নের নেশায় মানুষ বিভোর। আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মহারা। নীতি-নৈতিকতার বাছ-বিচার নেই। সে দিক থেকে মানুষ বড্ড উদাসীন। বস্তুবাদী ও জগৎপূজারি মানুষ এমনই হবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়; কিন্তু যখন দেখি এ ব্যাধিতে আলেম-ওলামা, দাঈ' ইলাল্লাহ ও কথিত ইসলাম দরদিগণ আক্রান্ত, তখন মনোজগতে বেদনার সিন্ধু তরঙ্গায়িত হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। মানুষ অনুকরণীয় মনে করে হৃদয়-মন দিয়ে যাদেরকে ভালোবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাদের অন্তর যদি ঘুণেধরা ও বিবেক অন্ধ হয়, তাহলে জাতি যাবে কোথায়(?)। অজানা মানুষ আলেম-ওলামার কাছে জানবে। কোনো বিষয়ে শরঈ সমাধান তাদের কাছেই চাইবে। সৎ ও নিষ্ঠাবান আল্লাহওয়ালা মানুষ মনে করে তাদেরকে অনুস্মরণীয়-অনুকরণীয় মনে করবে। পরিতাপ এই যে, আয়না দেখায়া তো বুরা মান গিয়া।

এক মুসলিম অপর মুসলিমের আয়নাসদৃশ। সৎ পরামর্শ ও পারস্পরিক ইসলাহ্ মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাহ বা সংশোধন মহান আল্লাহর কাছে ভীষণ পছন্দনীয়। দু'জন মু'মিনের মাঝে বিবাদ মীমাংসাকারী ব্যক্তি মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে। কিন্তু এ পুরস্কার প্রাপ্তির পথ বেশ কন্টকাকীর্ণ। মীমাংসা করতে গেলেই বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। যাদের কাছে আপনার প্রত্যাশা যে, সহজেই সত্য মেনে নেবেন এবং সঠিক ফায়সালায় সন্তুষ্ট হবেন, তারাই সবচেয়ে বেশি বেঁকে বসবে। উল্টো আপনাকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করবে। বাহ্যিক লেবাস, আচার-আচরণ দেখলে মনে হবে তারাই দুধে ধোয়া সাদাসিধে সাধু-সজ্জন। কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় বলে মানতে নারাজ। কিন্ত কেন(?) স্বার্থে আঘাত পড়বে? আত্ম-প্রতিষ্ঠার জোয়ারে ভাটা পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে? কিংবা ভবিষ্যৎ অভিলাষ ও স্বপ্ন পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি হবে? তাকি আর মেনে নেওয়া যায়? বিপত্তি তো এখানে।

আমানতদারিতা ও নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের পথে হাঁটলে সাময়িকভাবে দুনিয়াতে লাভবান হওয়া যাবে ঠিকই কিন্তু পরপারে পাকড়াও থেকে কোনোভাবেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। বিচারতো মরণের পর। সেতো আরেক জগৎ। যা হবার অদৃশ্য জগতেই হবে। সাজা না জাযা হলো মানুষতো তা দেখবে না। তাতে অসুবিধা কি? দুনিয়ায় তো আমি সফল। কর্তৃত্বপরায়ণতায় আমিতো সফল। কিন্তু জাগতিক এ সফলতা যে ক্ষণস্থায়ী তা কি কখনো ভেবে দেখেছি?

মানুষ আছে মনুষ্যত্ব নেই। নীতি আছে প্রয়োগ নেই। নৈতিকতার খোলস আছে কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। কথায় পটু কাজে আমড়া কাঠের ঢেঁকি। অন্যকে উপদেশ খয়রাত করতে জানি, কিন্তু নিজ আমলের ঘটি ফাঁকা। লাভ কি তাতে? আয়না এক নিঃস্বার্থ দর্পণ। আপনার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা যেমন আয়নায় দেখা যায়, তেমনি ভীষন্নতার ছাপ থাকলেও তা ভেসে ওঠে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কি একবার জিজ্ঞেস করেছি– আমি যা করছি তা কতটা ইনসাফপূর্ণ? বিবেকের আয়না কি আমার স্বচ্ছ? না কি সেখানেও মরণব্যাধি ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে? তাহলে তো আমি আত্মঘাতি দুরারোগ্য মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা– এ প্রবাদ কি আমার জন্যই যথার্থ?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানুষের দেহে একটুকরা মাংস আছে যা ঠিক থাকলে পুরো দেহই সঠিক থাকে। আর যদি তাতে বিভ্রাট দেখা দেয়, তাহলে সর্বাঙ্গে সর্বনাশ হয়ে যায়। সেটিই হলো মানুষের অন্তরাত্মা। আর এখানেই প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। তাক্বওয়া না থাকলে 'ইল্‌ম, 'আমল কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাক্বী বান্দার কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করে থাকেন। আল-কুরআন ঐ শ্রেণির মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেবে। আর তাদের জন্যই নয়নাভিরাম জান্নাত। আসুন! আত্ম সমালোচনা করি। নীতি ও নৈতিকতাকে শাণিত করি। সত্যকে সত্য বলি। ন্যায়কে সমর্থন ও অন্যায়-অবিচারকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখি। তবে-ই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যাবতীয় মিথ্যা ও অন্যায় বিদূরিত হবে। দুনিয়ায় হবো আদর্শ মানুষ এবং আখিরাতে পরম সাফল্য লাভ করে হবো ধন্য। মহান আল্লাহই হিদায়েতের মালিক। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম স্থাপনা

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর (কা'বা) যা বাক্কায় (মক্কার পূর্ব নাম বাক্কা) অবস্থিত। এটা বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (রয়েছে) মাকামে ইব্রাহীম। যে ব্যক্তি এই ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যারা সামর্থ্য রাখে আল্লাহর জন্য এই ঘরে এসে হজ্জব্রত পালন করা তাদের উপর আবশ্যিক। আর যে কুফ্রী করে নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজাহানের মুখাপেক্ষী নন।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

إِنَّ শব্দটি حروف مشبه بالفعل (অর্থাৎ- ক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অব্যয়) অর্থ- নিশ্চয়। أَوَّلَ অর্থ- প্রথম। بَيْتٍ অর্থ- ঘর। وُّضِعَ শব্দটি فعل ماضى مجهول واحد مذكر অর্থ- নির্মাণ করা হয়েছে। لِلنَّاسِ-এর মধ্যে ل অক্ষরটি حرف جر আর النَّاس শব্দটি مجرور অর্থ- মানুষের জন্য। لَلَّذِيْ অর্থ যা بِبَكَّةَ অর্থ- বাক্কায়। مُبٰرَكًا অর্থ- বরকতময়। وَّ অর্থ- এবং هُدًى অর্থ- পথ প্রদর্শন। ل অক্ষরটি حرف جر আর الْعٰلَمِيْنَ শব্দটি مجرور অর্থ বিশ্ববাসীর জন্য। فِيْهِ অর্থ- এর মধ্যে রয়েছে। اٰيٰتٌ অর্থ- নিদর্শণসমূহ। بَيِّنٰتٌ অর্থ- সুস্পষ্ট। مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ অর্থ- ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পদচিহ্নযুক্ত পাথরখণ্ড (এই পাথরখণ্ডটিকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়)। وَ অর্থ- এবং مَنْ অর্থ- যে। আর دَخَلَهٗ-এর মাঝে دَخَل শব্দটি فعل এবং ه অক্ষরটি فاعل অর্থ- তাতে প্রবেশ করবে। اٰمِنًا অর্থ- নিরাপদ। وَ অর্থ- এবং لِلّٰهِ শব্দের ل অক্ষরটি حرف جر আর الله শব্দটি مجرور অর্থ- আল্লাহর জন্য। عَلَى শব্দটি حرف جر আর النَّاسِ শব্দটি مجرور অর্থ- মানুষের উপর। حِجُّ শব্দটি مضاف আর الْبَيْتِ শব্দটি مضاف إليه অর্থ- এই ঘরে এসে হজ্জব্রত পালন করা। مَنِ اسْتَطَاعَ অর্থ- যার সামর্থ্য আছে। إِلَيْهِ অর্থ- এর দিকে। سَبِيْلًا অর্থ-পথ। وَ অর্থ- এবং مَنْ অর্থ- যে। আর كَفَرَ শব্দটি فعل অর্থ- সে কুফ্রী করল। فَإِنَّ اللهَ অর্থ- আর নিশ্চয় আল্লাহ। غَنِيٌّ এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। অর্থ- ধনী। عَنِ শব্দটি حرف جر আর الْعٰلَمِيْنَ শব্দটি مجرور অর্থ- বিশ্ববাসী থেকে।

দরস

আলোচ্য আয়াতে কারীমার প্রথম আয়াতটিতে ইয়াহুদীদের একটি অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অভিযোগটি সে সময়ের, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মহান আল্লাহর নির্দেশে ক্বিবলা পরিবর্তন করে বাইতুল মুক্বাদ্দাসের দিক হতে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ইয়াহুদীরা তখন বলতে লাগলো– বাইতুল মুক্বাদ্দাসই তো প্রথম 'ইবাদতখানা। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার অনুসারীরা কেন ক্বিবলা পরিবর্তন করল? তাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন। তাদের এই বক্তব্য মিথ্যা।

** প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৬-৯৭।

সত্যি হলো– ধরার বুকে মানুষের 'ইবাদতের জন্য প্রথম নির্মিত ঘর হচ্ছে কা'বা। হাদীসে আছে–

আবূ যার (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন– মসজিদুল হারাম। আবারো প্রশ্ন করা হলো– এরপর কোনটি? উত্তর বললেন– মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।[২]

সুতরাং বুঝা গেলো ইয়াহুদীদের বর্তমান ক্বিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস-এরও চল্লিশ বছর পূর্বে মুসলিমদের বর্তমান ক্বিবলা কা'বা নির্মিত হয়েছে। কা'বা ঘরটি মক্কায় অবস্থিত। মক্কারই একটি নাম– بكة (বাক্কা)। با বর্ণের জবরের সাথে। بكة (বাক্কা) শব্দটির অর্থ- ভেঙ্গে দেওয়া, গুড়িয়ে দেওয়া। যেহেতু বাক্কা তাকে ধ্বংসকারী বড় বড় জালেমদের গর্দান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় তাই তাকে বাক্কা বলা হয়। একটি বর্ণনায় এসেছে– আসমান-জমিন সৃষ্টিকালে পানির পৃষ্ঠের উপর সাদা ফেনার ন্যায় যে বস্তুটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটিই কা'বা অতঃপর জমিনকে তার নীচ থেকে বিস্তৃত করা হয়েছে।[৩]

প্রাচীনকাল থেকেই এই কা'বার প্রতি মানুষের সম্মানপ্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কাবা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত মানবজাতির জন্য নির্মিত প্রথম 'ইবাদতখানা এটিই। দ্বিতীয়তঃ এই গৃহ বরকতময়। তৃতীয়তঃ এটি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। চতুর্থত এতে রয়েছে সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন। রয়েছে মাকামে ইব্রাহীম। রয়েছে হাজরে আসওয়াদ। রয়েছে যম্‌যম্ কূপ। এই ঘর বিশ্ববাসীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যে এই ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।

যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে তার জন্য এই ঘরে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করা আবশ্যিক। হজ্জ ইসলামের মৌলিক পঞ্চস্তম্ভের একটি। এটি শর্তসাপেক্ষে ফর্‌য। আর এই ফর্‌য 'ইবাদতটি ফর্‌য হিসেবে জীবনে একবারই করতে হবে।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আকরা' ইবনু হাবেস নবী করীম (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! হজ্জ কি প্রত্যেক বছর ফর্‌য নাকি জীবনে একবার ফর্‌য? তিনি বললেন– না, এটি বরং জীবনে একবারই ফর্‌য। যে বেশি করবে তা তার জন্য নফল হবে।[৪]

কারো উপর হজ্জ ফর্‌য হওয়ার জন্য শর্ত হলো– কাবা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার খরচ, সেখান থেকে বাড়ি ফেরার খরচ এবং এ পর্যন্ত পরিবারের লোকদের ভরণপোষণের খরচসহ কারো যদি শারীরিক সামর্থ্য থাকে তাহলে তার উপর হজ্জব্রত পালন করা ফর্‌য। মহিলাদের জন্য মাহরাম সাথে থাকা শর্ত। চাই সে ব্যক্তি নিজ খরচে ভ্রমণ করুক বা মহিলার খরচে।

হজ্জের বহু ফায়দা রয়েছে। অন্যতম ফায়দা হলো– হজ্জের একমাত্র প্রতিদান-জান্নাত। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'এক 'উমরাহ্ অপর 'উমরাহ্ পর্যন্ত সময়ের (সগীরা গুনাহের) কাফ্‌ফারাস্বরূপ। আর জান্নাতই হলো কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান'।[৫]

হজ্জে আরো একটি ফযীলত হচ্ছে– হজ্জ জীবনের পূর্ববর্তীগুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَوْ بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ)، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ لِأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِيْ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُوْ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قَالَ : أَنْ يُغْفَرَ لِيْ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُوْ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

ইবনু শামাসা আল-মাহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ যখন আমার

[২] *সহীহুল বুখারী- হাদীস নং- ৩৩৬৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৫২০।*
[৩] *তাফসীরে জালালাইন।*
[৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৭২১।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৭৭৩।*

অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি বায়'আত করতে পারি। রাসূল (ﷺ) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, কি ব্যাপার হে আমর? আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, কি শর্ত করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমার (পিছনের সব) গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন, হে 'আম্র! তুমি কি জানো না, 'ইসলাম' তার পূর্বেকার সকল পাপ বিদূরিত করে দেয় এবং 'হিজরত' তার পূর্বেকার সকল কিছুকে বিনাশ করে দেয়। একইভাবে 'হজ্জ' তার পূর্বের সবকিছুকে (পাপ) বিনষ্ট করে দেয়।[৬]

সর্বোপরি হাজীগণ হচ্ছেন মহান আল্লাহর মেহমান। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ : الْغَازِيْ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহর মেহমান হলো তিনটি দল– মহান আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও 'উমরাহ্কারী'।[৭]

যে ব্যক্তি তার উপর ফর্যকৃত এই হজ্জকে অস্বীকার করে, তার এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ- সকল মানব-দানব ও ফেরেশ্তাকুল এবং তাদের 'ইবাদতের তিনি অমুখাপেক্ষী।

মোটকথা, ধরার বুকে প্রথম 'ইবাদতখানা হিসেবে নির্মিত কা'বা যা মুসলিম জাতির ক্বিবলা। সারা পৃথিবী থেকে জাতি-গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে হজ্জমৌসুমে লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছুটে আসে এই ঘর তাওয়াফ করতে। এ ঘরে এসে মানুষ অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে। হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে নিজের গুনাহ-খাতা সাফ করে। মাক্কামে ইব্রাহীমকে সালাতের মুসল্লা বানিয়ে সালাত আদায় করে, যম্যমের পানি পান করে মানুষ তাদের দেহে-মনের তৃষ্ণা মিটায়। ❑

[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১২১।*
[৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৬২৫।*

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

[১৭ নং পৃষ্ঠার পর]

"ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না। আর জেনে বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।"[৮]

এ আয়াতে শিকারের বিনিময় ফর্য হওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর শাস্তি ও জরিমানার ক্ষেত্রে জেনে বুঝে হত্যার শর্ত যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর জেনে বুঝে শিকার না করা হলে তাতে বিনিময়ও নেই এবং কোনো গুনাহও নেই। কিন্তু যখনই মুর্খ ব্যক্তি জানতে পারবে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তির স্মরণ হবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরত হবে এবং বাধ্যতা থাকবে না, তখন দ্রুত নিষিদ্ধ কাজ ছেড়ে দেয়া আবশ্যক হবে। আর যদি ওযর দূর হওয়া সত্ত্বেও নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি ফিদয়া বা বিনিময় যা শরিয়তে নির্ধারিত হয়েছে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কোনো মুহরিম মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে ঘুমে থাকা পর্যন্ত তার কোনো গুনাহ নেই। তবে জেগে গেলেই তার প্রতি মাথা থেকে কাপড় সরানো আবশ্যক। ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢাকা নিষেধ জানার পরেও যদি কেউ মাথা ঢেকে রাখে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি ফিদয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ইহরামের কোনো নিষিদ্ধ কাজ করল, কিন্তু তা বৈধকারী কোনো ওযরের (অসুবিধা) কারণে; তাহলে তার প্রতি নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে ফিদয়া ওয়াজিব হবে, কিন্তু কোনো গুনাহ হবে না। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

"আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না। তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে সিয়াম (তিনটি রোযা) কিংবা সাদাক্বাহ (ছয় মিসকীনের খাবার) বা কুরবানী দ্বারা ফিদয়া দিবে।"[৯]

তৃতীয় অবস্থা : ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বিনা কোনো শরিয়াতী ওযরে ইহরামের কোনো নিষিদ্ধ কাজ করল, তাহলে তার গুনাহগার হওয়ার সাথে-সাথে তার প্রতি ফিদয়াও ওয়াজিব হয়ে যাবে। ❑

[৮] *সূরা মায়িদাহ্ : ৯৬।*
[৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبرُوْرٌ.

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– সর্বোত্তম কাজ কী? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখা। জিজ্ঞাসা করা হলো– তারপর কী? তিনি বললেন, মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– অতঃপর কী? তিনি বললেন, মাবরূর (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮)*

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি (মহান আল্লাহর জন্য) হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোনো অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মতো (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২১, ১৮১৯-১৮২০; সহীহ মুসলিম- হা. ৩৩৫৭-৩৩৫৮)*

⊡ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

⊡ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা হজ্জকে ‘উমরাহ্ ও ‘উমরাহ্কে হজ্জের অনুগামী করো। (অর্থাৎ- হজ্জ করলে ‘উমরাহ্ ও ‘উমরাহ্ করলে হজ্জ করো।) কারণ, হজ্জ ও ‘উমরাহ্ উভয়েই দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে যেইরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে। *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৬৩০-২৬৩১; জামে‘ আত্ তিরমিযী; আন্ নাসায়ী প্রমুখ অন্য সাহাবী হতে; ত্বাবারানী- হা. ১১০৩৩)*

⊡ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيْشَةِ تَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَمْ يَفِدْ إِلَيَّ لَمَحْرُوْمٌ.

⊡ আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন, যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত। *(ইবনু হিব্বান- হা. ৩৭০৩; বাইহাক্বী- হা. ১০৬৯৫; আবূ ইয়া‘লা- হা. ১০৩১; সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৬৬২)*

⊡ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَن رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ.

⊡ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, হজ্জ ও ‘উমরাহ্কারীগণ মহান আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। তারা মহান আল্লাহকে আহ্বান করলে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। আর তারা তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৯২; সহীহ তারগীব- হা. ১১০৯)*

⊡ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِيْ الْفَرِيْضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ.

⊡ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা (ফর্য) হজ্জ পালনে ত্বরা করো। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন্ অসুবিধা এসে উপস্থিত হবে। *(মুসনাদ আহমাদ- ১/৩১৪, হা. ২৮৬৭; ইরওয়া- ৪/১৬৮; সহীহুল জামে‘- হা. ২৯৫৭)*

⊡ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ.

⊡ আবূ বক্র সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হলেন, কোন হজ্জ সর্বশ্রেষ্ঠ?’ তিনি বললেন, উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়্যাহ এবং কুরবানী বিশিষ্ট (হজ্জ)। *(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৮২৭; আদ্ দারেমী- হা. ১৭৯৭; হাকিম- ১/৬২০)*

প্রবন্ধ

পবিত্র হজ্জ : সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

–মোহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

হজ্জ ইসলামী পূণর্জাগরণের অন্যতম মাধ্যম। হজ্জ উদ্বেলিত লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের এক সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শাশ্বত মধুর বাণী :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ "

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার দ্বারে উপস্থিত, তোমার কোনো অংশীদার নেই, তোমার নিকট উপস্থিত। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নিয়ামতের সামগ্রী সবই তোমার। সর্বত্র তোমার রাজত্ব, তোমার কোনো অংশীদার নেই।"[১০]

রামাযান মাস যেমন সমগ্র মুসলিম জাহানে তাক্বওয়া পরহেযগারীর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত, ঠিক তেমনি হজ্জও মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামী যিন্দেগী ও জাগরণের এক মহা মূল্যবান মুহূর্ত। যা ইসলামী শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্দেশিত ইলাহী ব্যবস্থাপনা। মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের যে অবস্থান এবং গুরুত্ব, ঠিক তেমনি সমগ্র দুনিয়ায় কা'বা ঘরের অবস্থান। এ যেন এক সেতুবন্ধন। সারা দুনিয়ার মুসলিম একই সারিতে, একই পোশাকে, একই শব্দ উচ্চারণে, একই কিবলা কা'বায়, এক মহান উদ্দেশ্যে সমাগত। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশ হতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে, এই হারামাইনে শরীফাইনে। একজন মানুষ যতই বিত্তবান ও প্রসারিত বিত্তের ও দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী হোকনা কেন, সে কি পারে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সাথে মোলাকাত করতে? কোনো আহ্বান করে দিলো এই দুর্লভ সুযোগ, অভাবিত অথচ আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য? পাহাড়, পর্বত, মরু, প্রান্তর, সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ছুটে এলো একই আদম সন্তান সেই আদি পিতা-মাতার মিলন কেন্দ্র, উপস্থিত হলো আদর্শের পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পুণ্য স্মৃতিময় অবিস্মরণীয় কীর্তিবহুল উপত্যকায়। জাগতিক কোনো আকর্ষণ পথরোধ করতে পারেনি আদম সন্তানের সেই পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দানে। আজ পৃথিবীর মানুষ কত পথ, কত বিশ্বাস ও 'আক্বিদায় বিভক্ত? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বিভক্তি হওয়া সত্ত্বেও ঐ সার্বজনীন শাশ্বত উদাত্ত আহ্বানকে পথরোধ করতে পারেনি। পাপ-পংকিল জীবনকে পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল সাদা কাপড়ের মতো করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়, জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ পানি পান, শ্রেষ্ঠ দৃশ্য অবলোকন, জীবনের শ্রেষ্ঠ কুরবাণী উৎসর্গ, শ্রেষ্ঠ হৃদয় মনকে একীভূত করে অঝর নয়নে গুনাহখাতা মাফ করার উদাত্ত আহ্বান হে প্রভু! তুমি ক্ষমা করে দাও তোমার বান্দাকে। কি অপূর্ব দৃশ্য! কে পারে ঐ অনুভূতির জোয়ার সৃষ্টি করতে? কে পারে ঐ সাবলীল হৃদয় নিংড়ানো তপ্ত অশ্রু ঝরিয়ে গন্তদেশ প্লাবিত করতে? লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল গণজমায়েত কিন্তু আশ্চর্য! নেই বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ-কলহ এবং স্বার্থপরতা সকলেই যেন আপন মায়ের সহোদর। সবাই যেন মহান আল্লাহর আমন্ত্রিত মেহমান। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ অর্থাৎ- "প্রত্যেক মুসলমান সহোদর ভাই।"[১১]

এখানে কোনো বর্ণ বৈষম্য নেই, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, রাজা-বাদশাহ সকলেই আপনজনের মতো পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করে সালাত আদায়ের যে দৃশ্য, তা কতইনা সুন্দর। কা'বা শরীফে আছে মাকামে ইব্রাহীম যা পবিত্র কা'বার দরজা থেকে উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পদচিহ্ন শক্ত পাথরের উপরে স্পষ্ট ছাপ অদ্যাবধি দৃশ্যমান যা কাঁচের মধ্যে। এখানে তাওয়াফ শেষে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

"তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।"[১২]

আরো আছে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর যা মহান আল্লাহর কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠাবেন, তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দ্বারা তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা সে

---

* *উপ-গ্রন্থাগারিক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯/১১৮৪।*

[১১] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১০।*

[১২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১২৫।*

কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।[১৩] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়, তখন দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে।"[১৪] আছে সাফা ও মারওয়া যা মা হাজেরার ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। হাজীদেরকে সাতবার এ দু'পাহাড়ের মাঝে দৌড়াতে হয়। এটাকে সাঈ' বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

"নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।"[১৫]

আরো আছে জমজমের পানি যা কা'বার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেননা এই কূপের পানি দিয়ে ভক্তির আবেগে অনেকে গোসল করত, কাপড় পরিষ্কার করত এমনকি এ স্থানে সালাত, মুনাজাত করত যা স্পষ্ট বিদআত। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "ভূপৃষ্ঠের সেরা পানি হলো জমজমের পানি। এর মধ্যে আছে পুষ্টিকর খাদ্য এবং রোগ হতে আরোগ্য।"[১৬] অন্য হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, সে উদ্দেশ্যই পূরণ হবে।"[১৭] এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা বা অফুরন্ত রাহমত। যার মূল উৎস মুখে পাইপ দিয়ে পানি উত্তোলিত হয় এবং সমস্ত হারাম শরীফে লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবগণসহ মক্কা নগরীর সাধারণ মানুষ জমজমের পানি পান করে এবং বিভিন্ন হোটেলে এ পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া মসজিদে নববী মদীনা, মসজিদে কুবা এমনকি পৃথিবীর সমস্ত হাজীরা ফেরার পথে এ পানি নিয়ে আসে। যার কোনো কমতি নেই, এর থেকে বড় মু'জিযাহ্ বা অলৌকিকত্ব আর কি হতে পারে? কা'বা থেকে উত্তর পূর্বদিকে মাত্র ২ কি.মি. অদূরে আছে গারে হিরা। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মহা অনুগ্রহ ও নিয়ামত এবং মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম তুহফা নিয়ে জিবরাঈল আমীন (আলাইহিস সালাম) যমীনে এলেন যে স্থানে সে স্থানটি যমীন থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল উঁচুতে একটি পাহাড়ের গুহায়। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গভীর রাতে পবিত্র রামাযান মাসে লাইলাতুল কদ্‌রে একাকী প্রভুর ধ্যানে মগ্ন ঠিক এ সময় এক শুভ মুহূর্তে বার্তা নিয়ে তাঁকে বলা হলো 'ইক্‌রা' অর্থাৎ- পড়ো তোমার প্রভুর নামে। এটাই হলো প্রথম আসমানী ওয়াহী। আমরা কয়েকজন সঙ্গী মিলে হেরা গুহায় উঠেছি। বড় কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্গম পথ। তারপর আছে বানরের আক্রমণ। ভাবতে অবাক লাগে কিভাবে মা খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে প্রিয় নবীর খোঁজ-খবর নিতেন? মক্কার সর্ববৃহৎ কবরস্থান জান্নাতুল মালা যা মসজিদুল হারামের উত্তর দিকে পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এখানেই উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবরস্থল। বাতনে মুহাসসার আরাফাত থেকে মিনায় প্রত্যাবর্তনকালে আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী স্থান। এই মুজদালিফায় রাতে অবস্থান করতে হয় কিন্তু ওয়াদীয়ে মুহাসসার ব্যতীত। এটা মুজদালিফার দক্ষিণে বেশ একটু দূরে। এখানে কেউ অবস্থান করে না, কারণ মহান কা'বা ধ্বংসকারী আবরাহার হস্তী বাহিনীকে এখানে নিশ্চিহ্ন করে দেন। চলন্ত গাড়ী এখান থেকে দ্রুত চলে যায় গযবের স্থান স্মরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾

অর্থাৎ- "তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মতো করে দেন।"[১৮]

আরো দেখলাম জেদ্দা লোহিত সাগরের উপকূলে ভাসমান মসজিদ মসজিদে রহমত। আমরা এখানে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। সুন্নাত তরিক্বায় সালাত, আযান হলো দু'রাকআত সালাত একটু পরে ইমাম সাহেব কাতার ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কাতার সোজা হয়েছে কি না, পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলেছে কি-না, তারপর সালাত শুরু করলেন। এখানে আছে কেসাস মসজিদ তার পাশে আছে বিশাল চত্বর। এখানে ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সবার সামনে শিরশ্ছেদ করা হয়। গারে সাওর যা মক্কা হতে ৫ মাইল দূরে মক্কা ইয়েমেনের যাত্রা পথে। এই প্রসিদ্ধ পাহাড়ের গুহায় মদীনায় হিজরতকালে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে তিন রাত অবস্থান করেন কুরাইশদের হত্যার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾

"যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) সাহায্য না করো তবে আল্লাহ (তাঁর সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাঁকে দেশান্তর করে দিয়েছিল, তিনি দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সময় উভয়ে গুহায় ছিলেন যখন তিনি

[১৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৯৬১, সনদ সহীহ।*
[১৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৮৮, সনদ সহীহ।*
[১৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৮।*
[১৬] *তাবারানী কাবীর- ১১১৬৭, সনদ সহীদ; ইরওয়াউল গালীল- ১১২৩।*
[১৭] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৯৬৪।*
[১৮] *সূরা আল ফীল : ৫।*

স্বীয় সাথীকে (আবূ বক্র [রাযিয়াল্লাহু আনহু]-কে) বলেছিলেন তুমি চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর সাহায্য) আমাদের সাথে রয়েছেন।"[১৯]

আরাফাতের বর্ণনা : ৯ই জিলহজ্জ তারিখে সূর্য উঠার পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। আরাফাতে ৯ই জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করাকেই হজ্জ বলে। এখানে জোহর ও 'আসর সালাত এক আযানে দুই ইকামাতে জমা ও কসর করতে হবে। অর্থাৎ- আযানের পর ইক্বামত দিয়ে জোহর দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। তারপর ইক্বামত দিয়ে 'আসর দুই রাকআত পড়তে হবে।[২০] ইমাম বা খতীব সাহেব মসজিদে নামেরা থেকে লক্ষাধিক জনতার উদ্দেশ্যে হৃদয়স্পর্শী খুৎবাহ্ দেন যা শুনতে হবে। হাজী সাহেবরা পাপরাশি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকেন।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আরাফাত দিবসের চেয়ে এমন কোনো দিবস নেই যখন আল্লাহ তা'আলা এত অধিক সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। সেদিন তিনি নিকটবর্তী হন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফেরেশ্তাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন, এরা কি চায়? রাযীন স্বীয় জামে গ্রন্থে আরো বেশি বর্ণনা করেছেন, সাক্ষী থাকো হে আমার ফেরেশ্তারা! আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।"[২১] এখানে উঁচু-নীচু, মধ্যবিত্ত, ধনাঢ্য, পদমর্যাদা কোনো পার্থক্য নেই। দু'খণ্ড সাদা কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে লাব্বাইক ধ্বনি বলে একত্রিত হয়ে থাকা সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ গণজমায়েত।

মদীনার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ– মসজিদে নববী যা মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের হাতে গড়া সেই প্রসিদ্ধ মসজিদ। আসহাবে সুফ্ফা বা নিঃস্ব দারিদ্র্য মুহাজির মক্কী সাহাবায়ে কিরাম সেখানে থাকতেন। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্মিত সেই খেজুর পাতা ও খেজুর গাছের তৈরী মসজিদ আর নেই। নয়নাভিরাম মূল্যবান পাথর স্বর্ণ, রৌপ্য খচিত সুদৃশ্য ইমারত ২০/২৫ লক্ষ মুসল্লী নর-নারী পৃথকভাবে দৈনিক সালাত আদায় করতে পারেন। ওযূ, গোসল, প্রস্রাব, পায়খানা সবই মাটির নীচের তলায়। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা যে, লক্ষাধিক মানুষ টয়লেট ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই এবং কোনো দুর্গন্ধ নেই, সার্বক্ষণিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য কর্মচারী নিয়োজিত। মসজিদের পাশে আছে মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর, তার পাশে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তারপর 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর একই লাইনে পাশাপাশি। রিয়াজুল জান্নাত এ স্থানটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিম্বর ও কবরের মধ্যবর্তী স্থান। যেমন- হাদীসে এসেছে– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ».

"আমার বাড়ী ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজের (কাওসার) উপর।"[২২]

বাকীউল গারকাদ যা মসজিদে নববীর অদূরে দক্ষিণ পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ অগণিত সাহাবায়ে কিরামের কবর। এখানে কবরের কোনো চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না, আছে শুধু এক টুকরা পাথর। উহুদের রক্তাক্ত যুদ্ধের ময়দান যা মদীনার মসজিদে নববীর ৪ কি.মি. উত্তরে, যার দৈর্ঘ্য ৯ কি.মি. এবং প্রস্থ ৩ কি.মি., যা মদীনার সবচেয়ে বড় পাহাড়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দারুণভাবে আহত হন ও তাঁর সামনের ৪টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তিনি রক্তাক্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে গেলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মুখমণ্ডলে প্রবাহিত রক্ত পরিস্কার করছিলেন আর বলছিলেন, সেই কওম কি করে সফল হতে পারবে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা যখমী করে দিয়েছে। তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কথা বলার পর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এই আয়াত নাযিল করেন[২৩]–

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

"একার্যে তোমার কোনোই কর্তৃত্ব নেই যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; পরন্ত নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।"[২৪]

খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ ক্ষেত্র মদীনা নগরীর উত্তর দিকে ৫৫৪৪ মিটার দৈর্ঘ এবং ৪.৬২ মিটার প্রস্থ এবং ৩.২৩ মিটার গভীর করে পরিখা খনন করা মক্কার কাফেরদের সশস্ত্র যুদ্ধের মুকাবিলা করার জন্য সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরামর্শে, এ পরিখা খনন ছিল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমর কৌশলের অন্যতম দৃষ্টান্ত। মসজিদে কুবা ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ যা মদীনা শহর থেকে ২ কি.মি. দক্ষিণে

[১৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪০।*
[২০] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক।*
[২১] *ইমাম মুসলিম, সুনান আন্ নাসায়ী, সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[২২] *বুখারী- হা. ১৮৮৮; মুসলিম- হা. ৩৪৩৬; আহমাদ- হা. ৭২২২।*
[২৩] *সহীহ মুসলিম- ২য় খণ্ড, ১০৮ পৃ.।*
[২৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১২৮।*

অবস্থিত। নবুয়তের ১৪ হিজরী, ৮ রবিউল আউয়াল ৬২২ সাল ২৩ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ (ﷺ) আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে মক্কা হতে হিজরাত করে 'আম্র ইবনু আউফ গোত্রের কুলসুম ইবনু আল হাদমের বাড়ীতে সর্বপ্রথম আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে সোম, মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করে ঐতিহাসিক কুবা মসজিদ নির্মাণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ﴾

"অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্বওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে।"[২৫]

"কেউ ওযূ করে উক্ত মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলে একটি 'উমরাহ্' করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।"[২৬] মসজিদে আল-কিবলাতাইন একই মসজিদে একই সালাতে প্রথমে জেরুজালেম বাইতুল মুকাদ্দিস এবং পরে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তন করার কারণে মদীনা নগরের মসজিদ আল-কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে আরবী রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে কিবলা পরিবর্তনের এ ঘটনা ঘটে। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন–

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾

"নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উত্তোলন অবলোকন করছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলামুখীই করবো যা তুমি কামনা করছো।"[২৭]

মদীনা হতে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে জুলহুলাইফা যারা মদীনা অথবা মদীনায় যিয়ারত করে যারা পুনরায় মক্কায় যাবেন হজ্জের জন্য এই স্থানটি তাদের ইহ্রাম পরা ও তালবীয়া পাঠের স্থান। এখানে একটি বড় মসজিদ ও খেজুর বাগান আছে। মদীনা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বাংলাদেশের শতাধিক ছাত্র অধ্যয়নরত। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধি মুহাম্মদ যাকারিয়ার প্রাইভেট গাড়ীতে চড়ে সমস্ত ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখেছি কি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ! এখান থেকে বাংলাদেশী ছাত্ররা উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে কুরআন ও সহীহ 'আক্বীদার দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীন মানবতার দৃষ্টান্ত : হজ্জ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীন মানবতা বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম। হজ্জের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর-সংসার, সাংসারিক জাগতিক সকল কাজ এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর মেহমান হিসাবে সফরে বের হতে হয়। সারা জীবন ব্যাপী কষ্টার্জিত অর্থে যে নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলা হয়, আনন্দ, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যে নিবিড় মায়াময় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, একমাত্র মহান আল্লাহর মহব্বতে সে সবকিছুর বন্ধন ছিন্ন করে 'লাব্বাইক' অর্থাৎ- আমি আমার মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, উচ্চারণ করে দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, সফরের সীমাহীন তাকলীফ সহ্য করে মহান আল্লাহর ঘরে উপনীত হতে হয়। এভাবে হজ্জ সম্পন্ন করে যখন কেউ ঘরে ফিরে আসে, তখন তার অবস্থা সদ্যজাত মা'সুম শিশুর মতো হয়ে যায়। সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি শুনেছি, নবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পাদন করবে এবং কোনোরূপ অশ্লীলতা ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে না, সে ঐ দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দান করেছে।[২৮] দুনিয়ার লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, পঙ্কিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হজ্জের দ্বারা যে চারিত্রিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়, তা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর কার্যকর ভূমিকা সত্যিই বাস্তবিক। ইহ্রাম বেঁধে 'লাব্বাইক' বলে যখন হারাম শরীফের চতুর্দিক থেকে মানুষ ছুটে আসে এবং বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে থাকে, তখন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকল ভেদাভেদ লোপ পায়। যে মহান স্রষ্টা আসমান-যমীন, জিন্-ইনসান তথা সমস্ত জগৎ ও মাখলুকাতের স্রষ্টা, যিনি আমাদের ইহ্-পরকালের একমাত্র প্রভু, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে হাযির হওয়ার পর দুনিয়ায় প্রচলিত মানুষের মনগড়া কৃত্রিম ভেদাভেদের কথা কখনও মনে স্থান পায় না। এমন অকৃত্রিম মানবতার বিকাশ কোনোভাবেই কল্পনা করা যায় না।

মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থল : পবিত্র কা'বা সারা বিশ্বের কেন্দ্র ভূমি, যেখানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র-গোত্র, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমবেত তাওহীদী জনতার সবলকণ্ঠে সুস্পষ্ট ঘোষণা, স্রষ্টার সমীপে বান্দার এই যে বিশ্বজনীন আবেগ উচ্ছ্বসিত উচ্চারিত কণ্ঠ; এর ফলে মানব জাতির এক ও নির্বিশেষ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সত্তার সর্বজনীন প্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ﴾

[২৫] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৮।*
[২৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪১২, সনদ সহীহ।*
[২৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৪৪।*
[২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫২১; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৩।*

"মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম বাক্কা); এটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।"[২৯]

এখানে সুস্পষ্টভাবে মানবজাতির সর্বপ্রথম 'ইবাদত গৃহ হিসাবে কা'বা ঘরকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের এ আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিল্লাতে মুসলিমার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে মিল্লাতের সকল সমস্যা, উন্নতি-অগ্রগতি আলোচনা-পর্যালোচনা করবে এবং পরবর্তীতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামকে আদর্শ হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা। তাই হজ্জ শুধু ব্যক্তিগত 'ইবাদত ও সাধারণ মুসলিমের আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলনই নয়; বরং বিশ্ব মুসলিমের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরও এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন যা বিশ্বসম্মেলন।

সৌদি সরকারের মানবসেবা : সৌদি সরকার যে পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের খাদেম তা ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত। রাসূল (ﷺ)-এর চাচা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র 'আব্বাস হাজীদের পানি পান করানো এবং হাজীদের মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করতেন। সেই সেবার ইতিহাস-ঐতিহ্যের চিত্র আজ হারামাইনে পরিচালিত হয়। মরুভূমির দেশ অনুর্বর উত্তপ্ত আবহাওয়ার দেশ, নদ-নদী, খাল-বিল, গাছপালা, বিরান দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের থাকা যাতায়াত, স্বাস্থ্য এবং পানীয় জলের যে অপূর্ব সমাহার তা আমাদের অবাক করে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের লোক বিশেষ করে পুলিশ, আনসার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দল সবাই হাজীদের সেবায় ব্যস্ত। কা'বা চত্বরে সাধারণ মানুষ হাজীদের সেবার জন্য কেউ খেজুরের প্যাকেট বিভিন্ন প্রকার ফলের জুস, লাবান বা দুধের পট, চা, কফি, যমযমের পানি গ্লাসে করে ক্লান্তি দূর করার জন্য হাজীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কা'বার পাশে হোটেল-রেস্তোঁরা থেকে প্যাকেট বিরানী, পাউরুটি, কোমল পানীয়, আপেল, কলা, মালটাসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার হাজীদের ডেকে ডেকে বিতরণ করছে এবং এ কাজ করে তারা প্রচণ্ড আনন্দবোধ করেন। রাস্তাঘাট সব পরিচ্ছন্ন কোথাও কোনো ময়লা আবর্জনা নেই। সার্বক্ষণিক পড়ে থাকা ময়লা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলার জন্য শতাধিক কর্মচারী কর্মরত। মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গ মুক্ত কোথাও কুকুর, শিয়াল সচরাচর দেখা যায় না। হজ্জের সময় আরাফাত, মুজদালিফা, মিনায় ও জামরাতুল আকাবায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা হাজীদের সম্মানে 'লাব্বাইক ও আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিচ্ছে, কেউ পানি ছিটাচ্ছে। মুরুব্বীদের মাথায় ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। আবার পুলিশকে দেখলাম পাখা দিয়ে হাজীদের বাতাস করছে। সৌদি সরকার ও সৌদিবাসীর অকৃত্রিম সহানুভূতি ও মানব প্রেমের দৃষ্টান্ত সমগ্র মুসলিমকে ধর্মীয় উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করবে, ইন্‌শা-আল্লাহ। মক্কা-মদীনার বাজার পবিত্র হজ্জ মৌসুমে দিন-রাত সব সময় প্রায় খোলা থাকে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, যখনি সালাতের সময় আযান হবে সাথে সাথে দ্রুত দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে ছুটে যায়। কবর পূজা, নযর নেয়াজ, মাজারে কুলখানি, ইসালে সওয়াব সৌদি সমাজমুক্ত। মাসাধিককাল পবিত্র কা'বা এবং কিছুদিন মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করলেন প্রাণ ভরে হৃদয় খুলে এই সালাতের সময়গুলো প্রত্যেকে দেখলেন সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন কিন্তু আপনি যদি মাযহাবী হন তাহলে জেদ্দা থেকে বিমানে উঠবার সাথে সাথেই ঐ কা'বা শরীফ আর মসজিদে নববীর আদায়কৃত সালাতের সময় ফেলে রেখে আসলেন। ঐ সময় আর সাথে করে দেশে আনলেন না। আপনি যদি এক মাস ওখানে থাকেন তবে ৩০ × ৫ = ১৫০-এর মধ্যে জুম'আ এগুলোর সময়সূচী ঐ নবীর দেশেই ফেলে আসলেন। আপনার ভাগ্যে ঐ মূল্যবান সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্ধারিত সময় দেশে এনে তা 'আমল করার সৌভাগ্য হলো না। তাহলে কি হারামাইন শরীফাইনের ঐ সালাত সন্দেহযুক্ত? যদি তাই হয় তাহলে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে কা'বা ঘরে যে প্রায় ১৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন তার পরিণতি বা কি হবে? এখন চিন্তা করুন আপনি কি ভাগ্যবান না দুর্ভাগা? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৩০]

ঐ দুই মসজিদসহ মক্কা-মদীনার সমস্ত মসজিদে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠের পর এক সাথে জোরে আমীন প্রতিধ্বনিত হয়। মাগরিবের আজান ও ইকামাতের মধ্যে দু'রাকআত সুন্নাত সালাত পড়ার 'আমলটা পবিত্র কা'বা শরীফে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে কমবেশি আদায় করে থাকেন। আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো জোড় এবং বেজোড় এটাও শুনেছেন। কিন্তু আফসোস! সঙ্গে আনতে পারলেন না। অথচ আনলেন জায়নামায, তসবীহ-টুপি, রুমাল, গহনা, কার্পেট, কম্বল, খেজুর, যম্‌যমের পানি আরও কতকিছু। তাই সবার উচিত মাযহাবী সংকীর্ণতা পরিহার করে খোলা মনে সহীহ হাদীসের অনুসরণ করা। তাহলে লক্ষগুণ সওয়াবের সালাত যথাযথভাবে আদায় হবে ইন্‌শা-আল্লাহ। ❑

[২৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯৬।*

[৩০] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

–শাইখ মুহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ

যে সব কাজ হজ্জ বা ‘উমরাহ্-এর ইহরাম অবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে তা হলো তিন প্রকার : **(১)** এমন কতিপয় কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম। **(২)** এমন কতিপয় কাজ যা শুধুমাত্র পুরুষদের প্রতি হারাম। **(৩)** এমন কিছু কাজ যা শুধুমাত্র নারীদের প্রতি হারাম।

প্রথমতঃ এমন সব কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম, তা হলো (সাতটি) :

১. মাথার চুল মুণ্ডন করা বা ছোট করা কিংবা উঠিয়ে ফেলা : এর দলিল মহান আল্লাহর বাণী–

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾

“আর কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না।”[৩১]

বিদ্যানগণ শরীরের সমস্ত চুলকে মাথার চুলের উপর ক্বিয়াস করেছেন। তাই ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্য শরীরের কোনো চুল দূর করা জায়িয নয়। আর আল্লাহ পাক মাথা মুণ্ডনের ফিদয়া এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

“তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে সিয়াম (তিনটি সিয়াম) কিংবা সাদাক্বাহ্ (৬ জন মিসকিনকে অর্ধ সা‘ করে খাদ্য প্রদান) বা কুরবানী দ্বারা ফিদয়া দিবে।”[৩২]

♦ আর প্রিয় নবী (ﷺ) স্পষ্ট করেছেন যে, সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে তিন দিন। আর সাদাক্বার পরিমাণ হচ্ছে তিন সা’ খাদ্য দ্রব্য ছয় মিসকীনের জন্য। প্রত্যেক মিসকীনকে আধা সা’ করে প্রদান করবে।[৩৩] আর কুরবানী হচ্ছে একটি ছাগল, তা এমন বয়সের হবে যা হাদীর (কুরবানী) ক্ষেত্রে আবশ্যক এবং তা যেন উপরোক্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়। এই ফিদয়াকে ওলামায়ে কিরামগণ ‘ফিদয়াতুল আযা’ (যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির মুক্ত হওয়ার উপায়)। এ নাম উপরোক্ত আয়াতের অংশ থেকে নেয়া হয়েছে–

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾

“তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হবে...।”

২. ইহরামের অবস্থায় নখ কাটা বা নখ উঠিয়ে ফেলা : এ বিষয়টিকে ওলামায়ে কিরামগণের প্রসিদ্ধ মতে মাথা মুণ্ডনের উপর ক্বিয়াস করা হয়েছে। (যা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্’র আয়াত নং- ১৯৬-তে উল্লেখিত হয়েছে।) হাতের নখ এবং পায়ের নখের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যদি কোনো একটি নখ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে কষ্ট অনুভব হয় তাহলে কষ্টদায়ক অংশটুকু কেটে ফেলে দিলে কোনো অসুবিধা নেই এবং তাতে কোনো ফিদয়াও লাগবে না।

৩. ইহরাম করার পর ইহরামের কাপড়ে কিংবা শরীরে অথবা এমন কিছুতে যা শরীরের সাথে লেগে তাঁকে তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করা : এর প্রমাণ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস, নবী (ﷺ) মুহরিম (ইহরামকারী ব্যক্তি) সম্পর্কে বলেন :

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ.

মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পাজামা, বুরনুস (মাথা ঢাকা জামা) পরিধান করবে না এবং এমন কাপড় যাতে জা’ফরান বা ওয়ার্স নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস স্পর্শ করেছে।[৩৪]

নবী (ﷺ) আরাফায় অবস্থানকালে যেই মুহরিম সাহাবীকে উঁটে মেরে ফেলেছিল তাঁর সম্পর্কে বলেন : সুগন্ধি তার নিকটে নিয়ে যাবে না। আর এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন : সে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়া (লাব্বায়কা...) পাঠে রত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।[৩৫] এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ।

অনুরূপ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধি নাকে টানা বা আরবী কফীতে (ক্বাহ্ওয়া) জা’ফরান মিশানো, যা কাহ্ওয়ার সাথে বা ঘ্রাণে প্রভাব বিস্তার করে, কিংবা চায়ে গোলাপজল বা এমন কিছু মিশানো যাতে সুগন্ধি হয় জায়িয নয়। তেমনি সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার করা জায়িয নয়। তবে ইহরামের পূর্বে যে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তা ইহরাম করার পরে অবশিষ্ট থাকলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল

---

[৩১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*
[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৬।*
[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮১৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১২০১।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১১৭।*
[৩৫] *সহীহুল বুখারী।*

(ﷺ)-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির চমক দেখতে পেতাম।[৩৬]

৪. নিজের অথবা অপরের বিবাহ দেয়া : এর দলিল নবী (ﷺ)-এর বাণী–

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

মুহরিম ব্যক্তি (ইহরাম অবস্থায়) নিজে বিবাহ করবে না, কোনো মেয়ের অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহও দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।[৩৭]

সুতরাং কোনো মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে কোনো মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয নয় এবং কোনো মেয়ের ওলী বা উকীল হয়ে বিবাহ দেয়াও জায়িয নয়। অনুরূপ কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোও জায়িয নয়। তেমনি কোনো মহিলার ইহরামে থাকা অবস্থায় বিবাহ দেয়াও জায়িয নয়। আর যদি ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হয় তাহলে তা বাতিল হবে, শুদ্ধ হবে না। এর দলিল নবী (ﷺ)-এর হাদীস :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

কোন ব্যক্তি যদি এমন 'আমল (কর্ম) করে যা আমাদের আদর্শ মুতাবিক নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৩৮]

৫. যৌন কামনার সাথে চুম্বন দেয়া, স্পর্শ করা কিংবা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি : এর দলিল মহান আল্লাহর বাণী–

﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"হজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার মনস্থঃ করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।"[৩৯]

আর 'রাফাস' (স্ত্রী সম্ভোগ)-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্ব কার্যাবলী, যেমন- চুম্বন দেয়া, খোঁচা দেয়া, কামভাব নিয়ে রসিকতা করা।

সুতরাং ইহরাম অবস্থায় থাকা কোনো ব্যক্তির জন্য নিজ স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা বা খোঁচা দেয়া বা রসিকতা করা জায়িয নয়। আর মহিলা যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য স্বামীকে এ ধরণের সুযোগ দেয়াও জায়িয নয়। এমন কি কামভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দিকে তাকানোও হালাল নয়; কারণ, এটাও স্পর্শের মতই সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত।

৬. সহবাস করা : এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী–

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

"অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হজ্জ করার মনস্থ করবে, তার জন্য হজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।"[৪০]

আর স্বামী-স্ত্রী মিলন হচ্ছে হজ্জ ও 'উমরাহ্ অবস্থায় সর্বাধিক বড় নিষিদ্ধ কাজ। যার দু'টি অবস্থা হতে পারে–

প্রথম অবস্থা : প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে যদি কোনো ব্যক্তি সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে তার প্রতি দু'টি বিষয় আবশ্যক হবে।

(ক) ফিদয়া (গুনাহ্ হতে মুক্তিপণ) ওয়াজিব হবে। আর তা হলো, এমন একটি উঁট অথবা গরু কুরবানী করা যাতে কুরবানীর পশুর আবশ্যক গুণাবলী যেন বিদ্যমান থাকে। এই কুরবানী যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ মাংস অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

(খ) যেই হজ্জে সহবাস হয়েছে সে হজ্জ বিনষ্ট হয়ে যাবে, অতএব তাকে অবিলম্বে আগামি বছর সেই হজ্জ কাজা করতে হবে।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) মু'আত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, 'উমার, 'আলী এবং আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে ইহরাম অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে? তাঁরা সকলে বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গিয়ে এবারের বাকী হজ্জের কাজগুলো সম্পূর্ণ করবে, অতঃপর আগামি বছর হজ্জ কাজা করবে এবং হাদী (কুরবানী) যবহ করবে।

ইমাম মালিক আরো বলেন যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আগামি বছর যখন স্বামী-স্ত্রী হজ্জ কাজা করবে তখন তারা যেন একে অপর থেকে পৃথক থাকে। এছাড়া অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজের কারণে হজ্জ বিনষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা : সহবাস যদি প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর হয়ে থাকে, অর্থাৎ- বড় জামরাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করার এবং মাথা মুণ্ডনের পর এবং তাওয়াফ ইফাযার (যিয়ারাহ) পূর্বে হয়, তাহলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার প্রতি প্রসিদ্ধ মতে দু'টো কাজ আবশ্যক হবে–

(ক) একটি ছাগলের ফিদয়া, যা যবহ করে নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ মাংস অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

---

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৩৮ ও সহীহ মুসলিম।*
[৩৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৪০৯।*
[৩৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮।*
[৩৯] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৯৭।*
[৪০] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৯৭।*

(খ) হারামের সীমানা অতিক্রম করে হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরামের নবায়ন করবে এবং সিলাই বিহীন ইহরামের কাপড় পরিধান করে ইহরাম অবস্থায় এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ইফাযা (যিয়ারাহ) করবে।

৭. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ হলো শিকার করা : আর শিকারী পশু হচ্ছে এমন স্থলচর প্রাণী যা খাওয়া হালাল কিন্তু তা সাধারণতঃ মানুষের পোষ মানে না। যেমন- হরীণ, খরগোশ এবং পায়রা। ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণীর শিকার করা হারাম হওয়ার দলিল মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

"আর ইহরাম অবস্থায় থাকা পর্যন্ত স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[৪১]

আরো আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

"ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না।"[৪২]

সুতরাং কোনো মুহরিম ব্যক্তির জন্য আয়াতে বর্ণিত শিকারী পশু শিকার করা জায়িয নয়, তা সরাসরি হত্যা করা হোক, অথবা তার হত্যার কারণ হওয়া কিংবা ইশারা-ইংগীতের মাধ্যমে হত্যার জন্য সহায্য-সহযোগিতা করা হোক বা তা হত্যার জন্য নিজ অস্ত্র অপর ব্যক্তিকে প্রদান করাই হোক।

তবে শিকারী পশুর মাংস খাওয়ার তিন অবস্থা হতে পারে–

প্রথম অবস্থা : কোনো শিকারী পশু যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজেই হত্যা করে কিংবা তা হত্যা করায় অংশ নেয় তাহলে উক্ত শিকারী পশুর মাংস মুহরিম ব্যক্তির এবং অন্যদের জন্যও হারাম।

দ্বিতীয় অবস্থা : শিকারী পশু যদি কোনো হালাল ব্যক্তি কোনো মুহরিম ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে শিকার করে, যেমন- মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকারী পশুর সন্ধান দেয় কিংবা শিকারকারী ব্যক্তিকে শিকার করার জন্য অস্ত্র প্রদান করে তাহলে উক্ত পশু মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম তবে অন্যের জন্য হারাম নয়।

তৃতীয় অবস্থা : কোনো হালাল ব্যক্তি যদি মুহরিম (ইহরামের অবস্থায় থাকা) ব্যক্তির জন্য শিকার করে তাহলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম হবে। কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম হবে না। কারণ, নবী (ﷺ) বলেছেন :

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

স্থলচর শিকারী পশু-পাখী তোমাদের (মুহরিম ব্যক্তির) জন্য হালাল, তবে তা যেন তোমরা নিজে শিকার না করো বা তোমাদের উদ্দেশ্যে যেন তা শিকার করা না হয়।[৪৩]

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি হালাল অবস্থায় একটি নীল গাভী শিকার করেন তখন তাঁর সাথীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তাঁরা তা হতে খান, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের সংশয় হয়, তখন তাঁরা নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন : কোনো (মুহরিম) ব্যক্তি তাকে শিকারী পশু সম্পর্কে ইশারা-ইংগীত করেছিল বা তাকে কোনো (মুহরিম) ব্যক্তি এটা শিকার করার নির্দেশ দিয়েছিল কি? তাঁরা বললেন, না (তা কেউ করেনি)। তিনি (ﷺ) বললেন : তাহলে তা তোমরা খেয়ে নাও।[৪৪]

আর যদি কোনো মুহরিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোনো শিকারী পশুকে হত্যা করে তাহলে তাকে তার বিনিময় দিতে হবে। এর দলিল মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾

"আর জেনে বুঝে তোমাদের কেউ হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোক ফায়সালা করে দেবে, তা কা'বাতে কুরবানী করার জন্য পাঠাতে হবে। কিংবা তার কাফফারা হলো কয়েকজন মিসকিনকে খাদ্যদান অথবা তদনুরূপ সিয়াম পালন, যেন সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।"[৪৫]

সুতরাং কেউ যদি কোনো পায়রাকে হত্যা করে তাহলে তার অনুরূপ হচ্ছে ছাগল। সুতরাং সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি আদায় করতে পারবে–

(১) একটি ছাগল যবহ করে পায়রার ফিদয়াস্বরূপ গরীব-দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করে দিবে,

(২) ছাগলের মূল্য ধরে টাকা দিয়ে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' করে প্রদান করবে। অথবা

[৪১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯৬।*
[৪২] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯৬।*
[৪৩] *সহীহ লি গাইরিহী : মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৪৮৯৪, ২২৫২৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮৫১ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৮২৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৮৪৬।*
[৪৪] *মুসনাদ আহমাদ ও সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিম।*
[৪৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯৬।*

(৩) প্রত্যেক মিসকীনের অন্নদানের বিনিময়ে একটি করে সিয়াম রাখবে।

আর গাছ কাটার বিষয়টি ইহরামের কারণে কোনো মুহরিম ব্যক্তির প্রতি হারাম হয় না। কেননা এটা ইহরাম সংক্রান্ত বিধান নয়। তবে যে ব্যক্তি হারামের সীমানার ভিতরে অবস্থান করবে তার প্রতি গাছ কাটা হারাম, সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় থাক বা না-ই থাক। অতএব আরাফায় মুহরিম ও যে মুহরিম নয় উভয় ব্যক্তির জন্য গাছ কাটা জায়িয। কিন্তু মুয্দালিফা এবং মিনায় উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্য গাছ কাটা হারাম। কারণ, আরাফা হচ্ছে হারাম সীমানার বাইরে পক্ষান্তরে মুয্দালিফা এবং মিনা হচ্ছে হারাম সীমানার ভিতরে।

এ সাতটি নিষিদ্ধ কাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম।

আর দু'টি বিষয় এমন রয়েছে যা ইহরাম অবস্থায় শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য হারাম। আর তা হলো–

১. মাথা ঢাকা : এর প্রমাণ নবী (ﷺ)-এর বাণী ঐ মুহরিম ব্যক্তির বিষয়ে যাকে আরাফায় অবস্থানকালে তার সাওয়ারী উষ্ট্রী মেরে দিয়েছিল–

اَغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ.

তোমরা তাকে পানি ও কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও ও তাকে তার (ইহরামের) দু'টো কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা ঢাকিও না।[৪৬]

সুতরাং কোনো পুরুষ ব্যক্তির জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা জায়িয নয়, যা মাথার সাথে লেগে থাকে, যেমন- পাগড়ী, বিভিন্ন প্রকারের টুপী ও রুমাল ইত্যাদী। তবে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে লেগে থাকে না তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- ছাতা, গাড়ীর ছাদ ও তাঁবু ইত্যাদী।

এর দলিল উম্মে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ করেছি। অতঃপর তাঁকে জামরাহ আকাবায় কঙ্কর মারার সময় অতঃপর সাওয়ারীর উপর চেপে ফিরে আসার সময় দেখি। তাঁর সঙ্গে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। তাঁদের একজন নবী (ﷺ)-এর সাওয়ারীর (উষ্ট্রী) রসী ধরে টানছিলেন এবং অপর ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর মাথার উপর নিজ কাপড় উঠিয়ে রৌদ্র হতে ছায়া করছিলেন।[৪৭]

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী (ﷺ)-এর জামরাহ আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাঁকে সূর্য্যের তাপ থেকে ছায়া করছিলেন। তবে ইহরাম অবস্থায় মাথায় বোঝা উঠানো জায়িয, যদিও তাতে মাথার কিছু অংশ ঢেকে যায়। কারণ, মাথার বোঝা দিয়ে তা ঢাকার উদ্দেশ্য করা হয় না। তেমনি পানিতে ডুব দেয়া জায়িয, যদিও পানিতে মাথা ঢেকে যাচ্ছে।

২. ইহরাম অবস্থায় সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা : এটা বিশেষ করে পুরুষদের জন্য হারাম। আর সেলাইকৃত কাপড়ের অর্থ হলো, এমন কাপড় যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের গঠনে তৈরী করা হয়। তা পুরো শরীরেই থাকে, যেমন মাথা ঢাকা জুববা এবং আরবী জুববা, কিংবা শরীরের কিছু অংশেই তা হোক, যেমন পাজামা, প্যান্ট, গেঞ্জী, আণ্ডার প্যান্ট, চামড়ার মোজা, কাপড় মোজা, হাত বা পায়ের মোজা।

এর দলিল 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমারের বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন যে, নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোনো ধরণের কাপড় পরিধান করতে পারবে? তিনি উত্তরে বলেন :

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخِفَافَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ.

(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুববা পরিধান করবে না। আর এমন কাপড় পরিধান করবে না যাকে ওয়ার্স নামক ঘাসের বা জা'ফরানের সুগন্ধী স্পর্শ করেছে।[৪৮]

তবে কোনো ব্যক্তির নিকট যদি সেলাই বিহীন কাপড় এবং তা ক্রয় করার পয়সাও না থাকে তাহলে জামা ও পায়জামা পরিধান করতে পারবে। তেমনি যদি স্যান্ডেল এবং তা ক্রয় করার পয়সাও না থাকে তাহলে মোজা পরিধান করতে পারবে। আর এ জন্য তার প্রতি কোনো ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। এর দলিল 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে আরাফার খুতবায় বলতে শুনেছি– কারো যদি (ইহরাম অবস্থায়) সেলাই বিহীন লুঙ্গী না থাকে তাহলে সে যেন পায়জামা পরিধান করে। আর যদি স্যান্ডেল না থাকে তাহলে যেন মোজা পরিধান করে।[৪৯]

কোন ব্যক্তি যদি জামা পরিধান না করে তা নিজ শরীরে জড়িয়ে নেয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। তেমনি যদি জুববা

[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৬৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১২০৬।*
[৪৭] *সহীহ মুসলিম।*
[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৩ ও সহীহ মুসলিম।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৪৩ ও সহীহ মুসলিম।*

বা আলখাল্লাকে শরীরে পরিধান না করে তাকে চাদররূপে ব্যবহার করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপ রিপুকৃত চাদর বা লুঙ্গী পরিধান করলে কোনো আপত্তি নেই। তেমনি যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ইহরামের কাপড়ে সুতা দ্বারা গিরা দেয় বা পিন ব্যবহার করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি আঙ্গটি, হাত ঘড়ি, চশমা এবং শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে, কিংবা নিজ কাঁধে মশক বা ব্যাগ ঝুলায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

অনুরূপ কেউ যদি প্রয়োজনে– যেমন খুলে পড়ার আশঙ্কা– নিজ চাদরে গিরা দিয়ে বেঁধে রাখে তাহলে কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এসব ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) হতে কোনো বাধা-নিষেধ বর্ণিত হয়নি। আর যে সব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার অর্থও বহন করে না, (সুতরাং তার উপর ক্বিয়াসও করা যাবে না।) নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরণের পোশাক পরিধান করতে পারবে? তখন উত্তরে নবী (ﷺ) বলেন :

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخِفَافَ.

(ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পাজামা-প্যান্ট এবং মাথা ঢাকা জুববা পরিধান করবে না।[৫০]

নবী (ﷺ) জবাবে এমন কপড়ের কথা বলেন, যা পরিধান করা যাবে না, যা প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত কাপড় ছাড়া সমস্ত রকমের কাপড় মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে। আর নবী (ﷺ) মুহরিম ব্যক্তির নিকট জুতো-স্যাণ্ডেল না থাকলে পায়ে মোজা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। তেমনি চক্ষুর সুরক্ষার উদ্দেশ্যে চশমা পরিধান করা জায়িয। উপরোক্ত দু'টি নিষিদ্ধ কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য।

পক্ষান্তরে মহিলারা মাথা ঢাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় যে কোনো কাপড় পরিধান করবে। তবে তারা অলঙ্কার ও সাজ-সজ্যা প্রকাশ করবে না, হাত মোজা পরিধান করবে না, মুখমণ্ডলের উপর নিকাব (ফাটল বিশিষ্ট পর্দা) পরিধান করবে না এবং সামনে নিকটে কোনো অপর পুরুষ না থাকলে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে না। তবে পুরুষ মানুষ সামনে পড়লে মুখমণ্ডল ওড়না লটকিয়ে ঢেকে নিবে। কারণ, অপর পুরুষদের সামনে মহিলাদের চেহারা খোলা জায়িয নয়।

আর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ইহরাম অবস্থায় এমন কাপড় দ্বারা কাপড় বদল করা জয়েয যা তাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। আর যদি ইহরাম অবস্থায় থাকা কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজের কোনো একটি করে ফেলে, যেমন সহবাস, শিকার করা বা অন্য কিছু, তাহলে তার তিনটি অবস্থা হতে পারে–

প্রথম অবস্থা : ইহরামের কোনো নিষিদ্ধ কাজ ভুলে গিয়ে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা বাধ্য হয়ে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় করে ফেলেছে, তাহলে তার উপর কোনো দোষ নেই, কোনো গুনাহও হবে না, কোনো ফিদয়াও (ক্ষতিপুরণ) লাগবে না এবং হজ্জ 'উমরাহ্ও বিনষ্ট হবে না। এর দলিল মহান আল্লাহর বাণী :

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।"[৫১]

আরো মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"আর তোমাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই, কিন্তু (ধর্তব্য হলো) তোমাদের অন্তরের সংকল্প।"[৫২] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"কোনো ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফ্রীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহাশাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফ্রীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে।"[৫৩]

যখন ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে কুফ্রী কাজে বা কথায় বাধ্য করা হয়েছে কুফ্রীর বিধান উঠে যায় তাহলে এর নিম্নের গুনাহসমূহের জন্য বাধ্য করা হলে তাতে অবশ্যই পাকড়াও হবে না। আর এই দলিলগুলো ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ ও অন্যান্য কাজে শামিল। যা প্রমাণ করে যে, অপারগ ব্যক্তির উপর থেকে বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় শিকারের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾

[৬ নং পৃষ্ঠায় বাকি অংশ]

[৫০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[৫১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*

[৫২] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৫।*

[৫৩] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১০৬।*

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাহার

–এস. এম আব্দুর রউফ*

[প্রথম পর্ব]

ভূমিকা : কুরআন এমন একটি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে যখন কোনো পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান-কিছুই ছিল না। কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস مصدر كل علم কুরআন যারা মানেন এবং যারা মানেন না, সকলে কুরআনের বিভিন্নমুখী হেদায়াত থেকেই আলো নিয়েছেন; বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসই হলো কুরআন। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই। বিজ্ঞানীদের মতে কুরআনের প্রতি ১১টিতে একটি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। এর দ্বারা তারা হয়ত কেবল বস্তুগত বিজ্ঞানসমূহের হিসাব করেছেন। কিন্তু এছাড়াও সেখানে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ও নভো বিজ্ঞান প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে জীবনের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখাগত বিষয়ক বিজ্ঞান। সে হিসাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞান বহন করে।

কুরআন মনুষ্য বিজ্ঞানের উৎস : মনুষ্য বিজ্ঞানের উৎস হলো অনুমিতি। যা যেকোনো সময় ভুল প্রমাণিত হয়। যেমন- বিজ্ঞানীরা বলেন, Science gives us but a partial knowledge of reality 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়'।[৫৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلَّذِیْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ﴾

"যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতির সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন পানিসিক্ত অজৈব পদার্থ থেকে।"[৫৫]

কুরআনে পৃথিবী, সৌরজগত, মহাবিশ্ব এবং সৃষ্টির সূচনার যে বর্ণনা দেয়া আছে তা সম্পর্কে ১৪০০ বছর আগে মানুষের কোনোই ধারণা ছিল না। যা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল একজন মরুচারী নিরক্ষর নবীর মুখ দিয়ে– যা ছিল মহান আল্লাহর কালাম। বিজ্ঞানের উৎস হলো মহান আল্লাহর ওয়াহী মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যেখানে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَكِیْمٍ حَمِیْدٍ﴾

"সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে এর মধ্যে মিথ্যার কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এটি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হতে।"[৫৬]

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. বিশ্বজগৎ সৃষ্টি : জগত সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে বলা হয়, 'কোটি কোটি বছর পূর্বে বিশ্বজগত একটি অখণ্ড জড়বস্তু রূপে বিদ্যমান ছিল। পরে তার কেন্দ্রে একটি মহাবিস্ফোরণ ঘটে, যাকে Big-Bang বলা হয়। সেই মহা বিস্ফোরণের ফলে আমাদের সৌরজগৎ, ছায়াপথ, তারকারাজি ইত্যাদি সৃষ্টি হলো এবং বিনা বাধায় সর্বত্র সন্তরণ করে চলল'। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এ তথ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে মিলিত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম।"[৫৭]

প্রশ্ন হলো– বিস্ফোরণ ঘটালো কে? সেখানে প্রাণের সঞ্চার হলো কিভাবে? অতঃপর বিশাল সৃষ্টিসমূহ অস্তিত্বে আনল কে? উত্তর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

২. প্রাণীর সৃষ্টি তত্ত্ব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ﴾

"তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়। অর্থাৎ- আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে।"[৫৮]

---

* *শুব্বান সভাপতি, ঢাকা-মানিকগঞ্জ জেলা; পিএইচডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৫৪] *মহাসত্যের সন্ধানে- মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮, ৬১ পৃ.।*

[৫৫] *সূরা আস্ সাজদাহ্ : ৭।*

[৫৬] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৪২।*

[৫৭] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩০।*

[৫৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১১৭।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَوَ لَمۡ يَرَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ كُلَّ شَىۡءٍ حَىٍّ ؕ اَفَلَا يُؤۡمِنُوۡنَ﴾

"যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করলাম এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে। তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) মানে না? অর্থাৎ- "পৃথিবী এবং মহাকাশ/বায়ুমণ্ডল একসময় একসাথে মিলিত ছিল এবং তা আলাদা করা হয়েছে বিশাল শক্তি দিয়ে।"[৫৯]

প্রাণের উৎস কি?

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পানি থেকেই প্রাণীজগতের উদ্ভব। অথচ কুরআন একথা আগেই বলেছে,

﴿وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَاءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤۡمِنُوۡنَ﴾

"আমরা প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি হতে। তবুও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?"[৬০]

প্রশ্ন হলো– পানি সৃষ্টি করল কে? অতঃপর তার মধ্যে প্রাণ শক্তি এনে দিলো কে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنۡ مَّآءٍ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰى بَطۡنِهٖ ۚ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰى رِجۡلَيۡنِ ۚ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّمۡشِىۡ عَلٰٓى اَرۡبَعٍ ؕ يَخۡلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ﴾

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্টকে এক ধরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দু'পায়ে হেঁটে আবার কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"[৬১]

৩. প্রতিটি প্রাণসত্তার দু'টি শক্তির জোড় : বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিটি প্রাণসত্তার মধ্যে রয়েছে বিপরীতধর্মী দু'টি শক্তির জোড়। যার একটি পজেটিভ বা প্রোটন এবং অপরটি নেগেটিভ বা ইলেকট্রন। এমনকি বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও রয়েছে এই জোড়ার সম্পর্ক। অথচ কুরআন বহু পূর্বেই এর তথ্য দিয়েছে,

﴿سُبۡحَانَ الَّذِيۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُوۡنَ﴾

"মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি ভূ-উৎপন্ন সকল বস্তু এবং মানুষ ও তাদের অজানা সবকিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।"[৬২]

৪. উদ্ভিদের জীবন আছে : উদ্ভিদের জীবন আছে, একথা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭ খ্রি.) মাত্র সেদিন আবিষ্কার করলেন। অথচ বহু পূর্বেই একথা কুরআন বলে দিয়েছে।

﴿وَالنَّجۡمُ وَالشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ﴾

"নক্ষত্ররাজি ও উদ্ভিদরাজি আল্লাহকে সিজদা করে।"[৬৩]

স্বয়ং রাসূল (ﷺ)-এর সম্মানে পাথর ও বৃক্ষসমূহ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। আকাশের মেঘমালা তাঁকে ছায়া দান করেছে।[৬৪]

এমনকি তাঁর হুকুমে ছায়াদার বৃক্ষ নিজের স্থান থেকে উঠে এসে তার নিকটে দাঁড়িয়ে তাঁকে ছায়া দান করেছে। আবার তাঁর হুকুমে স্বস্থানে ফিরে গেছে।[৬৫] এগুলো সবই উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ বহন করে।

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাণ : এমনকি এর চাইতে বড় তথ্য কুরআন প্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা আজও যা প্রমাণ করতে পারেনি। আর তা হলো– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রাণ আছে এবং আছে বোধশক্তি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ اسۡتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡاَرۡضِ ائۡتِيَا طَوۡعًا اَوۡ كَرۡهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيۡنَا طَآئِعِيۡنَ﴾

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রবিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে।"[৬৬]

৬. সবকিছু সর্বদা মহান আল্লাহর গুণগান করে : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যকার সবকিছু সর্বদা মহান

[৫৯] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩০।*
[৬০] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩০।*
[৬১] *সূরা আন্ নূর : ৪৫।*
[৬২] *সূরা ইয়া-সীন : ৩৬।*
[৬৩] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৬; ইস্‌রা : ৪৪; সূরা আন্ নূর : ৪১ প্রভৃতি।*
[৬৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৬২০।*
[৬৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩০১২; আদ্ দারেমী- হা. ২৩।*
[৬৬] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ১১।*

আল্লাহর গুণগান করে। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا﴾

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যকার সবকিছু তাঁরই গুণগান করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে না। কিন্তু ওদের গুণগান তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।"[৬৭]

এগুলো সবই মহান আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে তথ্য কেবলমাত্র কুরআনই আমাদেরকে প্রদান করেছে।

৭. মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ﴾

"আসমানকে আমি নিজের ক্ষমতায় বানিয়েছি এবং সে শক্তি আমার আছে। আর মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।"[৬৮]

আয়াতাংশ وَإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ- مُوْسِعُ অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে একথার অর্থ দাঁড়ায় এ বিশাল বিশ্বজাহানকে একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হইনি; বরং ক্রমাগত তার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি এবং তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির নতুন নতুন বিস্ময়কর দিক প্রকাশ পাচ্ছে।

"মহাবিশ্ব ছয়টি পর্যায়ে তৈরি হয়েছে এবং প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি হয়েছে চারটি পর্যায়ে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ﴾

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি।"[৬৯]

"পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে/বায়ুমণ্ডলে প্রাণ আছে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۭ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ﴾

"এই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।"[৭০]

গত ২০২১ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মেঘে অত্যন্ত উঁচুতেও বিপুল পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু আছে।

৮. মহাকাশ বিজ্ঞান : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾

"দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল-সব কিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই।" অর্থাৎ- "সূর্য পূর্ব দিকের দু'টি প্রান্তে উঠে এবং পশ্চিম দিকের দু'টি প্রান্তে অস্ত যায়।"[৭১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ﴾

"আজ তুমি দেখছো পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছো ভালোই জমাটবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংঘবদ্ধ করেছেন? তিনি ভালোভাবেই জানেন তোমরা কি করছো। অর্থাৎ- পৃথিবী নিজস্ব অক্ষে ঘুরছে।"[৭২]

"সূর্য্যের নিজস্ব অক্ষ রয়েছে, এটি গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ঘুরে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ﴾

"না সূর্য্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।"[৭৩]

---

[৬৭] *সূরা ইস্‌রা : ৪৪।*
[৬৮] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৪৭।*
[৬৯] *সূরা ক্বা-ফ : ৩৮।*
[৭০] *সূরা আশ্ শূরা- : ২৯।*
[৭১] *সূরা আর্ রহ্‌মা-ন : ১৭।*
[৭২] *সূরা আন্ নামল : ৮৮।*
[৭৩] *সূরা ইয়া-সীন : ৪০।*

"পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল নয়; বরং তা ডিমের মতো উপরে নিচে চ্যাপ্টা।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا﴾

"এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।"[৭৪]

"প্রথমে মহাকাশে সবকিছু ছিল ধোঁয়া, তারপর অভিকর্ষের প্রভাবে তা একত্র হয়ে পৃথিবীর মতো গ্রহের জন্ম দিয়েছে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ﴾

"তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন : ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো : আমরা অনুগতদের মতোই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম।"[৭৫]

"পৃথিবীর সমস্ত পানি এসেছে মহাকাশ থেকে, পরিমিত ভাবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ﴾

"আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি। আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।"[৭৬]

ধারণা করা হয় ধূমকেতু এবং উল্কার মাধ্যমে আদি পৃথিবীতে পানি এসেছে।

৯. চাঁদ-সূর্য্যের আকৃতি এবং দূরত্ব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾

"সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসেবের অনুসরণ করছে চাঁদ এবং সূর্য্যের আকৃতি এবং দূরত্ব সুনিয়ন্ত্রিত।"[৭৭]

সূর্য চাঁদ থেকে ৪০০ গুণ বড় এবং চাঁদ পৃথিবী থেকে যত দূরে, সূর্য তার ৪০০ গুণ বেশি দূরে। এ কারণেই পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হয়। সূর্য যদি এর থেকে কাছে বা চাঁদ যদি এর থেকে দূরে হতো, অথবা চাঁদ ছোট হতো বা সূর্য যদি আরও বড় হতো, তাহলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হতো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ﴾

"পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে সেই সমস্ত বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন– অর্থাৎ- "মহাকাশের সম্প্রসারণের গতি যদি আলোর গতি থেকে বেশি না হতো, তাহলে কখনও রাত হতো না কারণ রাতের আকাশের প্রতিটি বিন্দুতে কোনো না কোনো নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাত এবং রাতের আকাশ থাকতো দিনের মতো জ্বলজ্বলে।"[৭৮]

১০. পদার্থ বিজ্ঞান : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ﴾

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে (তার কাছে) যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। অর্থাৎ- সময় আপেক্ষিক।"[৭৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ﴾

"ফেরেশতারা এবং রূহ্ তার দিকে উঠে যায় এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[৮০]

পৃথিবীতে যত লোহা আছে তার সব এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে একমাত্র সুপার নোভার বিস্ফোরণে মহাবিশ্বে লোহা সৃষ্টি হয়, যা উল্কার মাধ্যমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ

---

[৭৪] *সূরা আন্ না-যি'আ-ত : ৩০।*
[৭৫] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ১১।*
[৭৬] *সূরা আল মু'মিনূন : ১৮।*
[৭৭] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৫।*
[৭৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯০।*
[৭৯] *সূরা আস্ সাজদাহ্ : ৫।*
[৮০] *সূরা আল মা'আ-রিজ : ৪।*

شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴾

"আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।"[৮১]

"নক্ষত্র যেখানে ধ্বংস হয়– ব্ল্যাকহোল।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ﴾

"অতএব না, আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের।"[৮২]

"পালসার –যা অতি তীব্র ছিদ্রকারি গামারশ্মি বিচ্ছুরণ করে এবং সেকেন্ডে বহুবার 'নক' করে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾

"কসম আকাশের এবং রাতে আত্ম প্রকাশকারীর। তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি? উজ্জ্বল তারকা।"[৮৩]

"২০০৬ সালের পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আবিষ্কার-মহাবিশ্বের সবকিছু সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে নেই; বরং নির্দিষ্ট কিছু পথে মাকড়সার জালের বুননের মতো ছড়িয়ে আছে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾

"শপথ বিবিধ আকৃতি ধারণকারী আসমানের।"[৮৪]

"আগুন জ্বালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে গাছের সবুজ পাতা।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اِلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ﴾

"তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।"[৮৫]

"বৃষ্টির পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ে মাটির কণাগুলো আয়নিত করে ফেলে, যার কারণে কণাগুলো "ব্রাউনিয়ান গতি"র কারণে স্পন্দন করা শুরু করে। তারপর আয়নিত কণাগুলোর ফাঁকে পানি এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ আকৃষ্ট হয়ে জমা হয় এবং মাটির কণাগুলো ফুলে যায়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ﴾

"আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে আছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করতে শুরু করেছে।"[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ﴾

"আমি আসমান থেকে বরকতপূর্ণ পানি নাযিল করেছি। অতঃপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্য শস্য উৎপন্ন করেছি।" অর্থাৎ- "মেঘের পানিতে মৃত জমিকে জীবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে।"[৮৭]

সমুদ্রের পানির উপরে ০.১ মিলিমিটার মোটা স্তর থাকে যাতে বিপুল পরিমাণে জৈব বর্জ্য পদার্থ থাকে, যা মৃত শৈবাল এবং প্ল্যাঙ্কটন থেকে তৈরি হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলো ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, লেড শোষণ করে। এই স্তরটি পানি বাষ্প হবার সময় পানির পৃষ্ঠটানের কারণে পানির কনার সাথে চড়ে মেঘে চলে যায় এবং বৃষ্টির সাথে বিপুল পরিমাণে পড়ে মাটির পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলো সরবরাহ দেয়। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

[৮১] *সূরা আল হাদীদ : ২৫।*
[৮২] *সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৭৫।*
[৮৩] *সূরা আত্ ত্বা-রিক্ব : ১-৩।*
[৮৪] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৭।*
[৮৫] *সূরা ইয়া-সীন : ৮০।*
[৮৬] *সূরা আল হাজ্জ : ৫।*
[৮৭] *সূরা ক্বা-ফ : ৯।*

আলোকিত জীবন

প্রফেসর ড. এম এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হু) ক্ষণজন্মা শিক্ষা সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০২(শেষ)]

প্রফেসর ড. আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল বারী তাঁর শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশমালায় ভ্রান্ত পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির নেতিবাচক দিকের আলোকে ইসলামী শিক্ষাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অভিমত ছিল : "যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনে পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া উদ্রেক করে না, ভালোবাসার বিকাশ ঘটায় না, দারিদ্র্য জর্জরিত, অভাবগ্রস্ত, উপেক্ষিত ও অবহেলিতদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করে না এবং তাদের সারিতে দাঁড়িয়ে তাদের কল্যাণ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বার্থের উপর সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে দেখার প্রেরণা দেয় না, আর যাই হোক, সে শিক্ষা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

ড. আল্লামা আব্দুল বারী অনুধাবন করেছিলেন, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র জীবন ধারা ও রীতিনীতি আছে। আর আছে তাদের নিজস্ব শিক্ষাধারা। আমরা বাঙালি মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্মীয় ভাবধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলন হওয়া দরকার। কিন্তু ম্যাকলের ভাবনা দ্বারা পুষ্ট যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে ভারতীয়রা নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বেমালুম ভুলে যাবে; চিরতরে মুছে যাবে। ম্যাকলের লেখা একটি চিঠিতে সে বিষয়ে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "It is my firm belief that if our plan's of education are followed up. There will not be a single idolator among the respected classes in Bengal thirty years since, And this will be effected without any efforts to proselytes."

অর্থাৎ- আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খৃষ্ট ধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনই হবে না। পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে এ দেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকবে না।

ম্যাকলের ভাবনার প্রতিফলন কিন্তু মুসলমানদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল এ বিষয়ে ড. এম এ বারী বিলক্ষণ অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ব্রিটিশদের "ভাগ করো শাসন করো" (Divide and Rule) নীতি আশ্চর্যজনক ও সার্থকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেকিউলার ও ধর্মভিত্তিক দু'ভাগেই বিভক্ত করেনি; বরং বাংলা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে খণ্ড বিখণ্ড করে ছেড়েছে। ওল্ড স্কীম, নিউ স্কীম, খারেযী ও ভারতের উত্তর প্রদেশে গড়ে উঠেছে বিপরীতমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড়ের 'এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ', 'দারুল উলুম দেওবন্দ' 'নাদওয়াতুল উলুম', লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লির জামেয়া মিল্লিয়া'। ব্রিটিশের এ শিক্ষানীতি ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সুদূরপ্রসারী ও সুপরিকল্পিত মহাচক্রান্ত।

অধুনা ইসলামী চিন্তাবিদগণ মুসলিম জাহানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচুর গরমিল লক্ষ্য করেছেন। একেক দেশে চালু রয়েছে একেক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। বস্তুতঃ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার যার ভিতরে থাকবে ইসলামী আদর্শানুগ একটি মৌলিক ঐক্য। শিক্ষার্থীরা নিউটন, গ্যালিলিও, রুশো, ভলতেয়ার, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকদের যেমন জানবে তেমনি জানবে নবী, রাসূল, খলিফা, বড়ো বড়ো মনীষী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজ সংস্কারকদের কথা। ড. এম এ বারী তাঁর অভিভাষণে কুরআন মাজীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ﴾

"সূর্য আবর্তন করে তার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, এটা প্রবল পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। আর আমি চন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক বাঁকা খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্য নাগাল পায় না চন্দ্রের, রজনী অতিক্রম করে না দিবসকে এবং প্রত্যেকে সন্তরণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে।"[৮৮]

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

[৮৮] সূরা ইয়া-সীন : ৩৮-৪০।

এ সব তো বিজ্ঞানীদের খোরাক, আবিষ্কারের সূত্র, কবি-সাহিত্যিকদের ভাবনার উৎস ও দার্শনিকদের চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্র। প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী'র সুপারিশমালার প্রতিপাদ্য কথা ছিল, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলবিদ্যার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা যাবে না। এ অগ্রগতির প্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু বর্তমানকেও গুরুত্ব দিতে হবে বলেই অতীতকে অস্বীকার করা যাবে না। পার্থিব উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে বলেই পারলৌকিক ভাবনা বাদ দেয়া যায় না। তাঁর ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, দেশে প্রচলিত দু'রকম শিক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে এমন এক জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে, যাতে করে উভয় দিকের সমন্বয় সাধিত হবে– শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয় লোকের কল্যাণ লাভের পথনির্দেশ মিলবে। মানবকুলের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির কথা পবিত্র কুরআন মজীদে বিঘোষিত হয়েছে–

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾

"প্রভু হে! আমাদের কল্যাণ দাও এ দুনিয়ায় আর কল্যাণ দাও পারলৌকিক জীবনেও।"[৮৯]

পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী মানবজাতির অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশে দারুণ দিক নির্দেশনা উপহার দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন–

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন; মাটিতে যা উৎপন্ন হয় (উদ্ভিদ), তাদের নিজেদের (মনুষ্য জাতির) মধ্য হতে এবং যে বস্তুর খবর তারা (মানুষ) রাখে না (সবই তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন)।"[৯০] তাহলে বিজ্ঞান ও ইসলামকে তো পৃথক করার সুযোগ নেই। তাঁর অভিমত এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি থাকবে যার গবেষণা ও অধিকার মানুষের পারলৌকিক ভাবনাকে যৌক্তিক করবে এবং ইহকালীন অর্জনকে নিশ্চিত করবে। ড. আব্দুল বারী স্যারের শিক্ষা সংস্কারের পরতে পরতে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃতবিদ্য পণ্ডিত ড. আব্দুল বারী স্যারের পাণ্ডিত্যের পরিসীমা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁর প্রতি দেশজোড়া পণ্ডিতদের মান্যতা অবাক করার মতো। তিনি শতব্যস্ততার মাঝে ইসলামী বিশ্বকোষ ও শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান পদে বরিত হয়েছিলেন। একটি অনন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়েছে একটি দর্শন, একটি সংস্কৃতি, একটি সভ্যতা, একটি প্রশাসনিক কাঠামো, একটি নৈতিক মানদণ্ড, তাওহীদভিত্তিক বৈচিত্র্যময় ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি উম্মাহ্। সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের অবদান কালজয়ী। এর প্রতিটি বিষয় বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। ইতিহাসের প্রথম মানুষই ইসলামের বিবেচনায় প্রথম মানুষ ও নবী। এ নিরিখে ইসলামের ইতিহাস সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব মুখরিত মানব ইতিহাসের সমার্থক। এমনিতরো শত-সহস্র জটিল বিষয়াদি অনুলেখন, সম্পাদন নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। ড. এম এ বারী অংশত হলেও সে কাজ আঞ্জাম দিয়ে জ্ঞান চর্চার জগতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পণ্ডিত-গবেষকদের চিন্তা ও আবিষ্কারের নানা ভুক্তি শিশুতোষ আকারে উপস্থাপনার পারঙ্গমতা তাঁর আর এক অনন্য কীর্তি। তিনি সফলতার সাথে শিশু বিশ্বকোষ বিরচনে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন যামানার পণ্ডিতদের মাঝে তাঁর ভাষার ব্যঞ্জনা ও শব্দের গাঁথুনি অসাধারণ। রচনার ক্ষেত্রে লয় ও লহরির সৃষ্টি তাঁর মেধা প্রাখর্যের পরিচয় বহন করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ড. এম এ বারী সমধিক পরিচিত। একজন ধীমান পণ্ডিত, বহু ভাষাবিদ ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মাত্র ২৩ বছর বয়সে এম এ বারী বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলোসফি (ডি. ফিল) ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম সংস্কার আন্দোলন'। তাঁর জন্মের আগের শতকের ম্রিয়মাণ মুসলিম জাতিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সংস্কার হয়েছিল সে বিষয়টিতে গবেষণা করতে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ঐ সংস্কারের যৌক্তিকতা, যথার্থতা ও কুরআন সুন্নাহর আলোকে তা কতটা সম্পাদিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক ভাণ্ডারে যাচাই বাছাইয়ের তাগিদ থেকে সম্ভবত ড. এম এ বারী গবেষণা করেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ

[৮৯] সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২০১।
[৯০] সূরা ইয়া-সীন : ৩৬।

এ আর গিব ও প্রফেসর যোশেফ শাখ্‌ত। ধানমন্ডির বাসা পরিবর্তনের সময় মুহতারাম স্যার প্রাবন্ধিককে ড. এইচ আর গিব হস্তলিখিত চিঠিগুলো দেখিয়ে ছিলেন। আমি হতবাক হয়ে ছাত্রকে ইংরেজ পণ্ডিতের স্বহস্তে লিখিত সৌন্দর্যময় লেখা প্রত্যক্ষ করেছি। ছাত্র হিসেবে ড. এম এ বারী তাঁর নিকট কতই না আদরের ছিলেন! সাত সমুদ্র তের নদী পারের সে চিঠি তার প্রমাণ বহন করে।

পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিতের সাথে তাঁর সখ্য ছিল। ছিল যোগাযোগ। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আলোচনা করতেন। সঠিক না হলে, যুক্তির নিরিখে প্রত্যাখ্যান করতেন। অসত্য তথ্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কোনো কথা বা অভিমত বরদাশত করতেন না। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ইসলামিক ভাবনা ও মুসলমানদের অধঃপতন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ধারণা পোষণ করতেন যে, 'ইসলাম জোরজবরদস্তিতে বিশ্বাসী' এবং মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। মানুষের কর্মে নয়; ভাগ্য ও নিয়তিতে বিশ্বাসী এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিরোধী। তারা আরও মনে করে, এ সকল বিশ্বাস ও মতবাদের কারণে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পশ্চাৎপদ। ফলে আধুনিক বিশ্বে মুসলিমরা একটি অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়।' পাশ্চাত্য মনীষীদের উপরিউক্ত অভিমত ক্ষুরধার জ্ঞানের অধিকারী ড. এম এ বারী'র দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আমরা তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা, আলাপচারিতা ও লেখনীতে সে সকল ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের প্রয়াস দেখতে পাই। ড. এম এ বারী ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারা তাওহীদুর রুবুবিয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা দাঁড় করেন। তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পেশ করে উদ্ধৃত করেন যে,

"Islam is not merely a religion, It is a total and unified way of the both religious and secular; It is a set of beliefs and way of worship; It is a vast integrated system of law; It is a culture and civilization; It is an economic system and a way of doing business; It is a polity and a method of governance: It is a special sort of society and a way of running a family; It's prescribes for heritance and divorce, this worldly and other worldly."

সমাজ, দেশ ও বিশ্ব সমস্যার সমাধানে শাশ্বত ইসলামের যুগপোযোগী ব্যবহারের বিশদ বিবরণ ড. এম এ বারী'র বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়। মানব জাতির সঠিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুপম উপহার। সব যুগের, সব বর্ণের ও সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য তা মুক্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্পদস্বরূপ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চাপিয়ে দেয়া 'জোর-জবরদস্তির' তক্‌মা প্রত্যাখ্যান করে সমান অধিকার নিয়ে বসবাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর লেখনী ও বক্তৃতাসূত্রে অবগত হওয়া যায়। "উনসুর আখাকা যালিমান আও মাযলুমান" হাদীস উদ্ধৃতি করে সম্প্রীতির মজবুত বন্ধনের বিষয়ে খ্রিষ্টান জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুসলিম জাতির প্রতি খ্রিষ্টান বিশ্বের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন পূর্বক ড. এম এ বারী অবহেলিত মুসলিমদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে মহান অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নেতিবাচক চিন্তাধারার বিষয়ে তার বক্তৃতায় বিশ্বের মুসলমানদের সতর্ক করেন। জ্ঞানের দীপ্ত মশাল ড. এম এ বারী সাংগঠনিক ও ধর্মীয় প্রচারপ্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে ড. এম এ বারী দারুণ ব্যস্ত থাকতেন। লিখবার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবে লেখা হয়ে উঠতো না। তবে তাঁর সুলিখিত কয়েকটি বইয়ের মধ্যে 'ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রগতি' এবং 'তাবলীগে দ্বীন ও আহলে হাদীস আন্দোলন' উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণাধর্মী লিখনশৈলী তথ্যের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতবর্গ অবগত ছিলেন। স্যারকে ওর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ও আই সি), মহাসচিব বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বই লিখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আলাপচারিতায় স্যার বিষয়টি আমার কাছেও উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সময়াভাবের কারণে সেটি সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বাস্তবে তাই-ই হয়েছিল।

একজন গবেষক ও শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে পরিচিতির পাশাপাশি ইসলামী ধর্মবেত্তা হিসেবে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইংলান্ডসহ আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তাঁর যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি ছিল। সাউদি রাষ্ট্রদূত শাইখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল খতীব, হারামাইন শরীফাইনের খতীব শাইখ 'আব্দুল্লাহ আস সুবাইল, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. 'আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহাসিন আত্ তুর্কী, ড. রাবি বিন হাদী উমায়ের আল মাদখালী, শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজীজ আল বাকরী, ড.

শাইখ আহমাদ আব্দুল লতীফ, শাইখ হামুদ মুহাম্মদ আশ শিমরীমি, শাইখ আব্দুর রহমান আল মুহাইযান, শাইখ মাহমুদ মুহাম্মদ বা-হাযেক, শাইখ 'আব্দুল্লাহ ওসমান আল হুসাইনী, সুদানের শাইখ মুহাম্মদ আবূ যায়েদ মোস্তফা, কুয়েতের সামী আন নাসের, শাইখ খলীল হাবস, সিরিয়ার শাইখ আ. বাকী মুহাম্মদ আশ শুবাইকী, ভারতের শাইখ আব্দুল হামিদ আব্দুল জব্বার রহমানী, শাইখ মুখতার আহমাদ নাদভী, শাইখ আব্দুল হামীদ রহমানী শাইখ আতাউর রহমান আল মাদানী, শাইখ আব্দুর রহমান আল মাজহারী, শাইখ আব্দুল ওয়াহাব আব্দুল ওয়াজেদ খিলজী, নেপালের আমীর শাইখ শামীম আহমাদ খান নদভী, শাইখ আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী, পশ্চিমবঙ্গের শাইখ হাফেজ আইনুল বারী আলীয়াভী, পাকিস্তানের আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, প্রফেসর সাজেদ মীর, প্রমুখ ব্যক্তিত্যের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল।

তিনি আহলে হাদীস অনুসারীদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দীর্ঘ দিনের সভাপতি ছিলেন। সংগঠনটি পরিচালনায় তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাণপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শীর ইনতেকালের অল্প কিছুদিন পরে[৯১] ১৯৬০ সাল থেকে আমৃত্যু সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি'র দায়িত্ব অতীব নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সাথে পালন করে এ দেশে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ইসলামী দাওয়াতের প্রসারে ভূমিকা রাখেন। প্রফেসর ড. এম এ বারী তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা, বিরল ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং সুন্দরবন থেকে জয়েন্তিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলা, সাড়ে পাঁচশত এলাকা এবং ছয় সহস্রাধিক শাখা জমঈয়ত গঠনের মাধ্যমে বৃন্তচ্যুত আহলে হাদীস জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছেন। তিনি জমঈয়তের অবিসংবাদিত নেতা ও কাণ্ডারী হিসেবে পাঁচটি সফল ও স্বার্থক জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পরিচিতি আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সংগঠনটির মাধ্যমে খিদমতে খালকের আওতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মাদ্‌রাসা, মসজিদ, ওযূখানা, ইয়াতীমখানাসহ নানা জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। মানবদরদি ড. এম এ বারী সহায়-সম্বলহীন কিন্তু ঈমানী চেতনায় দীপ্তমান নওমুসলিমদের জন্য গড়ে তোলেন ঢাকার অদূরে ভাওরাইদ নওমুসলিম প্রকল্প।[৯২] শিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায়ে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে[৯৩] ঢাকার অদূরে বাইপাইলে প্রায় ৫২ বিঘা জমি ক্রয় করেন। বর্তমানে সেখানে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনলোজি ভবন, আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মডেল মাদরাসা, ইয়াতিমখানা এবং একটি আধুনিক মহিলা মাদরাসা রয়েছে।

আনুপূর্বিক বিবেচনায় প্রফেসর ড. এম এ বারী সমকালীন যামানার একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও প্রশাসক ছিলেন। আধুনিকতার সাথে ইসলামের সখ্যতার সম্পর্ক চিরদিনের; বৈরিতা কিংবা সাংঘর্ষিক নয়; বিষয়টি চমৎকার করে উপস্থাপন করেন। তিনি মানব সৃষ্টি ও বিকাশের মর্মমূলে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের[৯৪] উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবেই সৃষ্টির পরতে পরতে বিজ্ঞানের খোরাক নির্দেশ করে ড. এম এ বারী বিপন্ন ও পথহারা মানবতার বহুল উপকার সাধন করেছেন। ড. এম এ বারী'র ইন্তেকালে আমরা ব্যথিত ও মর্মাহত। বারগাহে মাওলা দু'আ করি যেন তাঁকে বেহেশ্‌তের প্রাচুর্য্যময় ফিরদাউস দান করেন –আমীন। ❑

[৯১] আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী মহোদয়ের ইন্তিকালের পর প্রফেসর ড. এম এ বারী মহোদয় সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নাফিল্ড ফেলোশিপের আওতায় গবেষণা করে পোস্ট ডক্টোরাল ডিগ্রি অর্জনের জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রাককালে তিনি আল্লামা কবীরুদ্দীন রহমানীর উপর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কবির উদ্দিন রহমানী একবছর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন।

[৯২] ঢাকা থেকে অন্যূন ৩০ কিলোমিটার দূরে ভাওরাইদ নওমুসলিম প্রকল্পটি অবস্থিত। প্রায় ৪বিঘা জমির উপর কাঁচা-পাকা ঘরে ২৪টি নওমুসলিম পরিবার বসবাস করেন। এতদ্ব্যতীত এখানে আছে একটি মসজিদ, পাঁচতলা ভবন ও মাদরাসা। সম্প্রতি গড়ে তোলা আধুনিক মাদরাসাটির নামকরণ করা হয়েছে- 'ড. এম এ বারী মডেল মাদরাসা'। উল্লিখিত কমপ্লেক্সটির পরিচালক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন।

[৯৩] ড. এম এ বারী'র প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অতি সম্প্রতি অনুমোদন লাভ করেছে। বিজ্ঞ বোর্ড অব ট্রাসিটজ বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করেছে "ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী" এক বুক আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির পথচলা শুরু হয়েছে।

[৯৪] সূরা আল মু'মিনূন- ১২-১৪।

ক্বাসাসুল হাদীস

মহান আল্লাহর উপর ভরসাকারী জনৈক মহিলা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

তাওয়াক্কুল বা মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ হলো– দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ের কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সঠিকভাবে অন্তর থেকে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। বান্দা তার প্রতিটি বিষয় মহান আল্লাহর ওপর সোপর্দ করবে। ঈমানে এই দৃঢ়তা আনবে যে, দান করা না করা, উপকার-অপকার একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অফুরন্ত রিযিক দান করবেন।

তেমনি মহান আল্লাহর উপর ভরসাকারী জনৈকা মহিলার ঘটনা আজকে আমরা আলোচনা করব।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'অতীতকালে দু'জন স্বামী-স্ত্রী ছিল। ধন-সম্পদ বলতে তাদের কিছুই ছিল না। তারা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। স্বামী বেচারা একদিন সফর করে বাড়ী ফিরে এলো। সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে সে তার স্ত্রীর নিকটে বলল, তোমার কাছে খাবার মতো কিছু আছে কি?

সে বলল, হ্যাঁ, সুসংবাদ শুনো তোমার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক এসেছে। [তার কাছে আসলে কিছুই ছিল না, কেবলই মহান আল্লাহর উপর আশা-ভরসা ও নির্ভর করে সে একথা বলেছিল]।

পুরুষ লোকটা বলল, তোমার ভালো হোক, তোমার কাছে কিছু থাকলে একটু জলদি করো।

সে বলল, হ্যাঁ আছে বৈকি। একটু সবর করো, আমরা মহান আল্লাহর রহমতের আশা করছি।

এভাবে যখন তার ক্ষুধা দীর্ঘায়িত হতে চলল তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, তোমার উপর রহম হোক, ওঠো, দেখো, তোমার কাছে রুটি-টুটি থাকলে তা নিয়ে এসো। আমি তো ক্ষুধায় একেবারে শেষ হয়ে গেলাম।

স্ত্রী বলল, এই তো চুলা পেকে এল বলে, তাড়াহুড়ো করো না। ধৈর্য্য ধরো, মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, তিনি আমাদেরকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন।

এভাবে আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলে যখন স্বামীটা আবার কথা বলবে বলবে এমন অবস্থা। ঠিক সে সময় মনে মনে ভাবল, আমি উঠে গিয়ে আমার চুলাটা দেখি, অতঃপর সে সেখানে গিয়ে দেখল, চুলা ছাগলের সিনার/রানের গোশতে ভরপুর হয়ে আছে, আর তার যাঁতা দু'টো থেকে আটা বের হয়ে চলেছে। এ এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! সে তো অবাক, কি হচ্ছে এসব!

এবার সে যাঁতার নিকট গিয়ে তা ঝেড়ে মুছে আটা বের করে নিলো এবং সে তার চুলা থেকে ছাগলের সিনার/রানের গোশ্ত বের করে আনল।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যাঁর হাতে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন তাঁর শপথ! মহিলাটি যদি তার দু'যাঁতায় যা আটা ছিল এবং ঝাড়ামুছা না করত তাহলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাঁতাটি তাকে আটা দিয়ে যেত'।[৯৫] ❑

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।

[৯৫] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৪৪৫; হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ- হা. ১৭৮৭৪; সহীহাহ্- হা. ২৯৩৭-এর আলোচনা দ্র.।*

বিশেষ মাসায়িল

ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ইসলাম

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

প্রশ্ন : ভূমিকম্পের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? এর কি কোনও পূর্বাভাস আছে? আর ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বিশ্বাস কি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করার অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : নিঃসন্দেহ ভূমিকম্প আল্লাহ তা'আলার মহাজাগতিক বড় নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বচরাচরের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং তার অপরিমেয় শক্তিমত্তার সামান্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি মাঝে-মধ্যে তার শক্তিমত্তা ও অপরাজেয় ক্ষমতার সামান্য কিছু প্রকাশ ঘটান মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যেন তারা তাঁকে চিনতে পরে এবং নিজেদের অসহায়ত্ব, অক্ষমতা, দুর্বলতা ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং পাপাচার থেকে ফিরে আসে। যেন মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং ভঙ্গুর এ পৃথিবীকে চিরস্থায়ী নিবাস মনে না করে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

"(আসলে) আমি ভয় দেখানোর জন্যই (তাদের কাছে আজাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠাই।"[৯৬] তিনি আরও বলেন,

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"অচিরেই আমি আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও (তা আমি দেখিয়ে দিবো), যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই (কুরআনই মূলত) সত্য; একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার মালিক সবকিছু সম্পর্কে অবহিত?"[৯৭] কুরআনে আরও এসেছে–

﴿وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾

"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ তা'আলা অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৯৯] তিনি আরও বলেন,

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾

"বলো, তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে) অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।"[১০০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

"যখন তারা একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলো তখন মূসা বলল, "রব আমার! তুমি চাইলে তো আগেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা যা করেছে, তার জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? এটি তো ছিল তোমার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এর মাধ্যমে তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট করো, আবার যাকে চাও হিদায়াত দান করো। তুমিই তো আমাদের

[৯৬] *সূরা বনী ইসরাইল/ইস্‌রা : ৫৯।*
[৯৭] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্‌সিলাত : ৫৩।*
[৯৮] *সূরা আয্ যুখরুফ : ৪৮।*
[৯৯] *সূরা সাবা- : ৯।*
[১০০] *সূরা আল আন'আম : ৬৫।*

অভিভাবক। কাজেই আমাদের মাফ করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ।"[১০১]

এভাবে একসময় মহান অধিপতি মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ ভূকম্পনে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। জগতময় সৃষ্টি হবে এক অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে শহর, নগর, বন্দর ও সকল জনপদ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে দরিদ্রের কুঁড়েঘর থেকে শুরু করে আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা, সুবিশাল টাওয়ার, সুরম্য রাজ প্রাসাদ, কল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। স্তব্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর কোলাহল। সেটাই হবে প্রতিশ্রুত কিয়ামত দিবস। আল্লাহ তা'আলা ভূমিকম্প (যিলযাল) নামক সূরা নাজিলের মাধ্যমে মানুষকে সে বিষয়ে অগ্রিম সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ○ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ○ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।"[১০২]

▪ ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বিশ্বাস কি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করার অন্তর্ভুক্ত?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রকৃতির আলামত ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া, বৃষ্টি-বাদল, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনাময় অগ্রিম খবর জানানো অথবা তাতে বিশ্বাস করায় কোনো দোষ নেই। কেননা মূলত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ডিভাইস, স্যাটেলাইট, যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাহায্যে আবহাওয়ার আলামত এবং পৃথিবীর ভূত্বকের গতিবিধি নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে এই পূর্বাভাস বলে থাকে। এটি আদৌ গায়েব বা অদৃশ্যের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যেমন- আমরা খালি চোখে ধুয়া দেখে দূরে কোথাও আগুনের খবর বলতে পারি, নাড়ির স্পন্দন দেখে অভিজ্ঞজনরা গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পারে। আবহাওয়ার অবস্থা দেখে বৃষ্টি বর্ষণের খবর দেয়া হয়, গ্রাম্য কৃষক কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র না জেনেই শুধু তার অভিজ্ঞতার আলোকে খরা, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রিম কথা বলতে পারে, ডাক্তার রোগীর শারীরিক অবস্থা দেখে অগ্রিম কিছু বিষয় আঁচ করতে পারে... ইত্যাদি। তবে এসব খবর ১০০% বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। আর তা নিশ্চিতভাবে বলাও সম্ভব নয়। এ থেকে একটা সম্ভাবনাময় ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। সর্বোচ্চ এসব ঘটার সম্ভাবনা আছে/এমনটা হতে পারে/এমন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে... এভাবে বলা যাবে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "এখনও পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি, যা ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে।"[১০৩]

এ সবই মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে আবহাওয়া, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও গর্ভের সন্তান ইত্যাদি সব কিছুর পরিবর্তন ঘটাতেও সক্ষম।

মোটকথা, বিভিন্ন আধুনিক মেশিনারিজ, ডিভাইস, স্যাটেলাইট, টেকনোলজি ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং প্রকৃতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশিত আলামতের উপর নির্ভর করে বৃষ্টি-বাদল, খরা-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আনুমানিক ও সম্ভাবনাময় পূর্বাভাস দেয়া বা তাতে বিশ্বাস করায় শরিয়তে কোনো বাধা নেই। এটা 'ইল্‌মে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

▪ আবহাওয়া অধিদপ্তর কিভাবে অগ্রিম ঝড়-বৃষ্টি, খরা, বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদির খবর দেয়?

বিজ্ঞানীগণ বলেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে কয়েকশ' মাইল উপরে আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইট নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করে। এগুলো বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ণয় করে এবং বায়ুর মধ্যে আর্দ্রতা বা ঈষৎ আর্দ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করে। পৃথিবীর ওপর মেঘ ও ঝড়ের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে টেলিভিশনে গৃহীত ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এভাবে সংবাদ পাওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিকরা অধিকতর নিশ্চয়তার সাথে নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারেন এবং ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারেন।[১০৪]

আর ভূমিকম্প পরিমাপ যন্ত্রের নাম হলো– ভূকম্প মাপক (ইংরেজি : Seismometer) এটি ভূত্বকের কম্পন পরিমাপক যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানত ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত বা অন্য যে কোনো কারণে সংঘটিত ভূত্বকীয় বা ভূগর্ভস্থ কম্পনের তীব্রতা মাপা হয়। এই কম্পন-তীব্রতার তথ্য-উপাত্ত ভূতত্ত্ববিদদেরকে ভূগর্ভের মানচিত্র বানাতে, ভূমিকম্পের উৎস এবং তীব্রতা বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

[১০১] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৫।*
[১০২] *সূরা আয্ যিলযাল : ১-৫।*
[১০৩] *dailyo.in।*
[১০৪] *দৈনিক প্রথম আলো।*

পুরোনো যুগে ব্যবহৃত ভূকম্প মাপক যন্ত্রকে সাধারণত ইংরেজিতে "সিজমোগ্রাফ" নামে ডাকা হতো। অপরদিকে "সিজমোমিটার" দ্বারা বর্তমান যুগে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক পরিমাপ এবং বিশ্লেষণের সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ভূকম্প মাপককে বুঝায়। আর "সিজমোস্কোপ" বা ভূকম্প বীক্ষণ যন্ত্রের শুধুমাত্র ভূমিকম্পের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৫]

▪ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অগ্রিম সতর্কবার্তা পাওয়ার পরও পাপাচার পরিত্যাগ না করা বড়ই দুর্ভাগ্য জনক!

দুর্ভাগ্য যে, আমরা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অগ্রিম সতর্কবার্তা পাওয়া বা স্বল্প-বিস্তর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পর আরও ভয়াবহ শির্ক-বিদআতে লিপ্ত। অসংখ্য মুসলিম নামায-রোযা পরিত্যাগ, যাকাত না দেয়া, সুদ-ঘুষ অব্যাহত রাখা, ধূমপান, মদ ও নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা, জিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বিভিন্ন কনসার্ট, মিউজিক, পর্ন, মানুষের অধিকার হরণ, অত্যাচার-নির্যাতন ইত্যাদি অসংখ্য অগণিত পাপাচারে হাবুডুবু খাচ্ছে! যখন বিপদ এসে যায় তখন কিছু মানুষ "আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ বাঁচাও" বলে চিৎকার করে আর রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তিলাওয়াত চলে। কিন্তু বিপদ কেটে গেলেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই! অথচ আল্লাহ তা'আলা অতীতে বহু পাপিষ্ঠ সভ্যতাকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছেন। এখনো ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে সব ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে। বর্তমান বিশ্বেও আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সকল দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করে দিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে অসংখ্য ভয়াবহ ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে– যার ভিডিও ও নানা স্থিরচিত্র আমরা ইচ্ছা করলেই অন্তর্জালে দেখে নিতে পারি।

মহান আল্লাহর ভাষায় সত্যি মানুষ চরম অজ্ঞ, জালিম এবং তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সব ধরনের দুনিয়া ও পরকালীন বিপদ-বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন আর মহা ধ্বংসযজ্ঞের পূর্বেই যেন আমরা তাওবাহ্ করে পরিশুদ্ধ হতে পারি– মহান রবের দরবারে সেই তাওফীক্ব কামনা করছি –আল্লাহুম্মা আমিন।

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।

[১০৫] *উইকিপিডিয়া।*

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা। আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন–

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবী করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরী জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *[অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.]*

সমাজচিন্তা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চরিত্র শিক্ষার নানান দিক

–মো. আরিফুর রহমান★

[প্রথম কিস্তি ৬৪ বর্ষের ২৫-২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত]
[দ্বিতীয় কিস্তি]

মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর এবং নির্মল চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। চরিত্র শিক্ষার আলোচনায় আমাদের পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসকে অগ্রে রেখেই আলোচনা করা উচিত। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস চরিত্র শিক্ষার সব থেকে উত্তম এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।" "আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।"[১০৬]

পরিবার, সমাজ এবং ভৌগোলিক অবস্থান মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। কোন পরিবারে সে বড় হচ্ছে, পরিবারের অন্যান্য সদস্য একে অপরের সাথে কেমনভাবে আচরণ করছে, তাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক, সমাজের অন্যান্যদের সাথে তাদের আচরণ, কথাবার্তা, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষকের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক, অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্পর্ক একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। চরিত্র একদিনে বা স্বল্প সময়ে গঠিত হয় না। এটি সামাজিকীকরণের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। জীবনভর ধরে সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। পরিবার, শ্রেণিকক্ষ, স্কুল, রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব, কর্মক্ষেত্র, হাটবাজারসহ প্রত্যেকটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমন কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তির চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।

চরিত্র কী?

সহজভাবে বলতে গেলে চরিত্র হলো আমাদের অভ্যাসের সমষ্টি। Character Education for the 21st Century (2015, 4) নামক একটা বই থেকে আমরা দেখে নিবো চরিত্রের সংজ্ঞা। ব্যক্তির মনোভাব, আচরণ, মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, মূল্যবোধ, সামাজিক এবং মানসিক দক্ষতা হলো চরিত্র। চরিত্রের গুণাবলি দক্ষতার থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা একজনের জানা বিষয়গুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে উপস্থাপন করে।

চরিত্র কীভাবে গঠিত হয়?

আমরা আগেই বলেছি, চরিত্র একদিনে গঠিত হয় না। আমাদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের কথাবার্তা আমাদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। একই কাজ বার বার অনুশীলনের ফলে আমাদের অভ্যাস গঠিত হয়। আমাদের অভ্যাসের সমষ্টিই আমাদের চরিত্র। এখানে মনে রাখা দরকার আমাদের চিন্তা-ভাবনা থেকেই চরিত্র গঠন শুরু হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, স্কুল এবং পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর অভ্যাস গড়ে তুলতে জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। শ্রদ্ধাপোষণ, দায়িত্বশীলতা, সহানুভূতি, দয়া ও যত্নশীলতা, দলগতকাজ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, বিশুদ্ধতা, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণাবলি চরিত্র গঠন করে। একই সাথে এই গুণাবলি সফলতার গল্প নির্মাণ করে।

চরিত্র শিক্ষা বা Character Education কী?

Character Education-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

"Character Education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. An intentional and comprehensive character education initiative provides a lens through which every of school becomes an opportunity for character development."

অর্থাৎ- চরিত্র শিক্ষা হলো মানুষের মূল নৈতিক মূল্যবোধ বুঝতে, যত্ন নিতে এবং কাজ করতে সাহায্য করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। একটি ইচ্ছাকৃত এবং ব্যাপক চরিত্র শিক্ষার উদ্যোগ একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে যার মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে চরিত্র বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়।[১০৭]

Gordon Vessels (1998) বলেন,

"Character education combines direct teaching and community-building strategies in various ways to promote personal and social integrity and the development of moral virtues, moral reasoning abilities, and other personal assets and qualities that make up maturity."

★ *আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার।*

[১০৬] *সূরা আর্ রূম : ৩০।*

[১০৭] *North Carolina Character Education- Informational Handbook & Guide II, 2006, p. 3।*

অর্থাৎ- চরিত্র শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অখণ্ডতা এবং নৈতিক গুণাবলি, নৈতিক যুক্তির ক্ষমতা এবং পরিপক্বতা তৈরি করে এমন অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পদ এবং গুণাবলির বিকাশের জন্য বিভিন্ন উপায়ে সরাসরি শিক্ষাদান এবং সমাজ- নির্মাণের কৌশলগুলোকে একত্রিত করে।[১০৮]

চারিত্রিক শিক্ষা বাড়ি, সমাজ এবং স্কুল থেকে আসে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে চরিত্রের বড় অংশ আসে।

কেন Character Education?

আমাদের সমাজে, পরিবারে, স্কুলে, হাটবাজারে, রাস্তাঘাটে সর্বোপরি রাষ্ট্রে সবকিছু ঠিকভাবে হচ্ছে না। অভিভাবক, কমিউনিটি, শিক্ষক এবং সর্বোপরি সমাজ যেটা শিশু, কিশোর বা যুবকদের নিকট থেকে প্রত্যাশা করছে সেটার অনুশীলন খুবই কম। স্কুল জীবনেই একজন শিক্ষার্থী হিংস্র হয়ে উঠছে। সে ধৈর্য্যশীল নয়। শিক্ষকের কথা শুনছে না। পিতামাতার অবাধ্য হয়ে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিচ্ছে। মোটকথা, সমাজের যে প্রত্যাশা তার কাছে এবং তার অনুশীলনের মধ্যে বড় গ্যাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমাজ একজন মানুষের নিকটে প্রত্যাশা করছে, সত্য, ধৈর্য্যশীলতা, ন্যায় বিচার, দয়া, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ, বিশ্বস্ততা, বিনয়, সম্মান, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ তাদের নিকট হতে পাচ্ছে কী? মিথ্যা, অধৈর্য্য, অন্যায়, নির্দয়তা, অবিশ্বাস, অহংকার, অমর্যাদা এবং অকৃতজ্ঞতা। প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির এই গ্যাপসমূহ পূরণ করাই Character Education-এর লক্ষ্য।

স্কুলে কেন Character Education প্রয়োজন?

স্কুলে Character Education কেন? এটি ভালো প্রশ্ন। পরিবারের পরেই স্কুল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষক এক একজন মডেল হিসেবে কাজ করে। শিক্ষক যেটা বলেন, যেভাবে শেখান, যেভাবে আচরণ করেন তা শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করে, অনুসরণ করে। একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপ্রেরণা। চরিত্র শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন স্কুলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। একজন শিক্ষার্থী স্কুলকে কীভাবে দেখে, স্কুল তার পছন্দ কি না, শিক্ষকদেরকে সে যত্নশীল এবং সমর্থনকারী মনে করে কি না, স্কুলে তার ভালো বন্ধু আছে কি না, স্কুলের পড়ালেখা তার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে কি না, স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা সে কার্যকর এবং সুন্দর মনে করে কি-না এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কিনা –এ সব বিষয় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

এখন যদি প্রশ্ন করি– **গ্রামের স্কুলে Character Education কেন?**

গ্রামের স্কুল স্থানীয় কমিউনিটির দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। স্কুলের খেলার মাঠটি হয়তো এলাকার একমাত্র খেলার মাঠ। স্থানীয় কমিউনিটি সেখানে খেলতে আসে। মিটিংয়ে আসে বা যেকোনো প্রকারের অনুষ্ঠানে যোগদান করে। অভিভাবকবৃন্দ স্কুলের সব শিক্ষক এবং পরিচালনা পর্ষদসহ কর্মচারীদের জানেন। একজন অভিভাবক অন্য অভিভাবকদের সাথে পরিচিত। এই প্রত্যেকটি অংশীদার এক অপরের সাথে তাদের ভালোমন্দ, পছন্দ অপছন্দের বিষয় আলোচনা করে। এ সমস্ত কারণে স্থানীয় কমিউনিটি বা অভিভাবকবৃন্দ স্কুলে Character Education বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ফিডব্যাক দিতে পারে। স্কুলে Character Education শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ, অভিভাবকদের এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণে একটি ইতিবাচক এবং নৈতিকতার পরিবেশ তৈরি করে। এটা আমাদের শেখায় কীভাবে সুন্দরভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায়।

কীভাবে Character Education বাস্তবায়ন করতে হবে?

প্রশিক্ষণ শুরু করার পূর্বে আমরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মতামত নিবো। তারা চরিত্র নিয়ে কী ভাবে? আমরা নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলো থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো।

মূল্যবোধ সংক্রান্ত :

- পরীক্ষায় ভালো ফল পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।
- সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা-বাস্তবে এই নীতিবাক্য মেনে চলা সম্ভব না।
- শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ের অনেক কাজ কর্মে শিশুরা দায়িত্ব নিতে পারে– যদি তাদের সুযোগ দেওয়া হয়।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবককে নিজ এলাকার পরিবেশ রক্ষা এবং বর্জ্য ও আবর্জনা কমানোর কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত।
- আমরা ন্যায়, অন্যায়, নীতি কথা, মূল্যবোধ নিয়ে অনেক কথা বলি এবং মাঝে মাঝে শুনেও থাকি এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? তোমরা কি উদাহরণ দিতে পারবে?
- আমরা ন্যায়, অন্যায়, নীতি কথা, মূল্যবোধ নিয়ে অনেক কথা বললাম। এ সংক্রান্ত কোন বিষয়গুলো তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যেগুলো স্কুল/শিক্ষকবৃন্দের থেকে শিখবে বলে আশা করো?
- তোমরা নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে স্কুল থেকে বাস্তবে কী কী শেখো? এবং কীভাবে শেখো?

[১০৮] *Integrated Effective Character Education Programs into Rural Schools: Measuring a Replicable Model, 2005, p. 9।*

▪ তোমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অনেক বিত্তবান এবং অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে-তোমরা এ বিষয়টা কীভাবে দেখো?

▪ নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে তোমরা বাবা মা বা পরিবার থেকে কিছু শেখো? কীভাবে শেখো?

▪ আমাদের সমাজে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা অনুশীলনে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে বলে তোমরা মনে করো?

▪ আমাদের সমাজে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা বাড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তোমরা মনে করো?[১০৯]

শিক্ষার্থীরা এই চ্যাপ্টারে কেমন উত্তর দিচ্ছে তা দেখে শিক্ষক বা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তারা কেমন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠছে।

অনুশীলন ছক : এখন কীভাবে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা যায় তা দেখবো।

প্রথমে আমরা **সিক্স পিলার মডেল**-এর মাধ্যমে অনুশীলন করবো। মনে রাখতে হবে চরিত্র অনুশীলনের ফসল। কাজ থেকে অভ্যাস এবং অভ্যাসই আমাদের চরিত্র বদলে দেয়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে সিক্স পিলার মডেল নিয়ে আলোচনা করা হলো। শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, আমরা নিজেরাও এগুলো অনুশীলন করতে পারি।

চরিত্রের ছয়টা গুণকে ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে একটা ছক তৈরি করবো। মনে করি **বিশ্বাসযোগ্যতা** একটি গুণ যার রং দিলাম নীল এর অধীনে থাকবে– সৎ হও, প্রতারণা, চুরি এবং ছলনা করো না, বিশ্বস্থ হও-যা তুমি কথা দিয়েছো তা সম্পাদন করো, ভালো কাজটি করার জন্য সাহসী হও, সুনাম অর্জন করো, পরিবার, বন্ধু, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হও।

শ্রদ্ধা হলো আর একটি গুণ। এর রং দিলাম হলুদ। এটি কীভাবে অর্জন করবো? দেখে নিই- অন্যের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা ঠিক যেমনটি অন্যের কাছ থেকে আশা করি, ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল হওয়া, খারাপ শব্দ/ভাষা ব্যবহার না করা কারণ আমি অন্যের কাছ থেকে খারাপটা আশা করি না, অন্যের অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করা কারণ আমিও চাই অন্যজন আমাকে বুঝুক, কাউকে হুমকি দিবো না, আঘাত করবো না কারণ কেউ আমার সাথে এগুলো করুক আমি চাই না; অপমান, রাগ এবং অমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।

দায়িত্ব হলো অন্যতম সেরা একটি চারিত্রিক গুণ। এর রং দিলাম সবুজ। এটা কীভাবে অর্জিত হয়? আমরা দেখি নিই- যে কাজ তোমার করার কথা সেটা করে ফেলো, সবসময় সবচেয়ে ভালোটা করো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখো, কাজ করার পূর্বে ভাবো এবং নিজের কাজের দায়বদ্ধতা নিতে শেখা।

সুবিচার এর রং মনে করি কমলা। কীভাবে শিখে নিবো এই গুণ? অন্যকে শুনুন, খোলা মনের হওয়া এবং অন্যকে দোষারোপ না করা।

যত্নশীলতা শেখা যায় দয়ালু হবার মাধ্যমে। এর রং দিলাম লাল। সমব্যথী হও এবং অন্যের প্রতি তোমার যত্ন দেখাও।

সুনাগরিকত্ব একটি অন্যতম সেরা চারিত্রিক গুণ। এর রং দিলাম বেগুনি। সুনাগরিকত্ব অর্জন করতে পারি-সমাজ ও স্কুলের জন্য ভালো কাজ করে এবং ভালো কাজ অন্যদের সাথে আলোচনা করে। একে অপরের সহযোগিতা করে। সমাজের নানান কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, একজন ভালো প্রতিবেশী হয়ে, আইনকানুন মেনে চলে, কর্তৃপক্ষকে শ্রদ্ধা করে এবং পরিবেশ রক্ষা করে।

এবার আমরা দেখবো এই ছকটি শিক্ষকবৃন্দ কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ক্ষেত্রে। উপরের ছকে নীল, কমলা, সবুজ, বেগুনি এবং লাল রংয়ের ঘর আছে। এই ঘরগুলোতে বিভিন্ন বিষয় আছে। এর জন্য আমরা একটা গাইডলাইন করতে পারি।

▪ এক মাসে যদি একই রংয়ের দু'টি বিষয়ের নিয়ম ভাঙে তবে সে শিক্ষার্থীর জন্য Counselling Slip প্রদান করা Counseling-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

▪ যদি এক মাসে সবকটি রং থেকে ৬টি নিয়ম ভাঙে তবে তার অভিভাবকদের নিকট চিঠি পাঠাতে হবে।

▪ এক এক ধরনের নিয়ম ভাঙার জন্য সে বিষয়টি ভঙ্গ করেছে লিখে তার সংশোধনীর জন্য চিঠি ধরিয়ে দিতে হবে। যেমন- 'ভাষা ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে', 'শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ অনুশীলন করতে হবে', 'কর্তৃপক্ষকে মান্য করতে হবে'। (এ ক্ষেত্রে স্কুলগুলো নতুন নতুন নিয়ম তৈরি করতে পারে।)

আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীরা এই চ্যাপ্টার সুন্দরভাবে অনুশীলন করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সহযোগিতা করবেন। এখানে সিক্স পিলার মডেলের আলোকে যে সব বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তা ইসলাম ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বিশ্বাসযোগ্যতা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব, সুবিচার বা ন্যায়বিচার, যত্নশীলতা এবং সুনাগরিকত্বের ব্যাপারে ইসলামে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল (ﷺ) সেগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে চরিত্র শিক্ষাকে আমাদের স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক করা দরকার। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের এই আবেদন। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

[১০৯] *Education Watch- 2017, p-187, 193, 194, 199।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

কায়রো : ইসলামী ঐতিহ্যের নিদর্শন

–আল আমীন বিন সুরুজ*

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করার সময় যে সকল শহরের নাম বারবার সামনে আসে সেগুলোর মধ্যে মিশরের কায়রো শহর অন্যতম। ইসলামী সভ্যতার অন্যতম এই শহর সম্পর্কে আজ আমরা জানার চেষ্টা করবো ইন্‌শা-আল্লাহ।

কায়রো শহরের প্রতিষ্ঠা : একজন সাধারণ দাস, যিনি পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন ফাতেমী সাম্রাজ্যের অন্যতম দক্ষ সেনাপতি, বলা চলে তাকে ধরেই ফাতেমী সাম্রাজ্যের উত্থান, তিনি হলেন আবুল হোসাইন জরহর ইবনু ‘আব্দুল্লাহ। আমরা যাকে জরহর আল সিকিলি নামে চিনি। তিনি খলীফা মুইজের নির্দেশে অন্যতম প্রাচীন শহর ফুসতাতের নিকটেই নতুন শহর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই শহরের নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রায় চার বছর ধরে এর নির্মাণকাজ চলতে থাকে।

কায়রো শহরের ভৌগোলিক অবস্থান : কায়রো উত্তর মিশরে ভূমধ্যসাগরের ১৬৫ কি. মি. দক্ষিণে, সুয়েজ উপসাগর ও সুয়েজখাল থেকে ১২০ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত। নীলনদের তীর ঘেঁষে শহরের জন্ম। ৪৫৩ বর্গকিলোমিটার সীমানার কায়রো শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩ মিটার উচুতে অবস্থিত।

শহরের জনবসতি : জনসংখ্যার বিবেচনায় কায়রো আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম বড় শহর। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী কায়রোর জনসংখ্যা প্রায় ৯.৫৪ মিলিয়ন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বসবাস।

রাষ্ট্রভাষা ও ধর্ম : যেহেতু মিশরের প্রধান ধর্ম ইসলাম এবং রাষ্ট্রভাষা আরবী সেহেতু কায়রো শহর এর ব্যতিক্রম নয়। মসজিদের শহর হিসেবেও কায়রোর খ্যাতি রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হচ্ছে খ্রিষ্টান।

ইসলামিক কায়রো বা ঐতিহাসিক কায়রো : ১৯৭৯ সালে ইউনেস্কো কায়রো শহরকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে।

ঐতিহাসিক স্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ : ইসলামী সভ্যতার অনন্য এই শহরে রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, দুর্গ ইত্যাদি। যেমন-

- **মসজিদ :** এ শহরের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে মসজিদে ইবনু তুলুন। ‘আব্বাসীয় স্থাপত্যের অন্যতম এই মসজিদ কায়রোর বৃহত্তর মসজিদগুলোর একটি।
- **আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় :** বিশ্বের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোর অন্যতম জামে আল আযহার। জামে আল আযহারের প্রতিষ্ঠাকাল ৩৬১ হিজরী রামাযান মাস। মূলত মসজিদরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও জামে আল আযহার ৯৭৫ সালে শাইখ সাইয়্যেদ আল ফারিদিকে প্রধান শাইখ নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। সে সময় শী‘আদের প্রভাব থাকায় আল আযহারে ব্যাপকভাবে শী‘আহ্ মতবাদ প্রচার প্রসার হয়। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ূবী মিশর জয় করার পর জামে আল আযহারকে শী‘আমুক্ত করেন। বর্তমানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং দেশ-বিদেশের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এখানে জ্ঞানার্জন করছে।
- **সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর দুর্গ :** ইতিহাসখ্যাত বীর যোদ্ধা সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফুসতাত ও কায়রো শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন। কালের সাক্ষী এই দুর্গ বর্তমান কায়রোর অন্যতম ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান।
- **মিশরের জাতীয় জাদুঘর :** প্রাচীন মিশরীয় পুরাকীর্তির এক বিস্তৃত সংগ্রহশালা মিশরের জাতীয় জাদুঘর। কায়রো জাদুঘর নামেও পরিচিত ১৯০১ সালে নির্মিত এই জাদুঘরে প্রায় লক্ষাধিক পুরাকীর্তির নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে।

নীলনদ : প্রাচীন মিশরের প্রাণকেন্দ্র এই নীলনদ। মিশরবাসীর জন্য নীলনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নীলনদের পাশেই আমাদের কায়রো শহর অবস্থিত। নীলনদের উৎপত্তি আফ্রিকান দেশ ইথিওপিয়ায়। মাঝপথে বহু দেশ ঘুরে কায়রো শহরের প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে নীলনদ।

উপসংহার : হাজারো ঐতিহ্যের শহর কায়রো। যুগ যুগ ধরে এই শহর জন্ম দিয়েছে শত শত মনীষী আর রাজা বাদশাহকে। এই শহরের বুকে রচিত হয়েছে হাজারো ইতিহাস। ইসলামী সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদানে ভরপুর কায়রো শহর মুসলিম সভ্যতার অন্যতম সম্পদ। ❑

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, ঢাকা।*

পরামর্শ

হজ্জের জন্য নিজকে প্রস্তুত করুন

–আরাফাত ডেস্ক

শুরু হয়েছে হজ্জের মৌসুম। চলতি মাসের একুশ তারিখ থেকে আল্লাহ তা'আলার মেহমানগণ বায়তুল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করেছেন। এবারের হজ্জ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। হজ্জ সম্পাদন করতে মোটা অংকের খরচের পাশাপাশি শারীরিক ধকলও সামাল দিতে হয়। এ জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে তা অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে। এ বছর যারা হজ্জে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কতিপয় পরামর্শ প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মাবরুর হজ্জ সম্পাদনের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

❖ প্রথমেই ঈমানকে নবায়ন ও 'আক্বীদাহ্কে শুদ্ধ করুন। যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকা অবস্থায় হজ্জ পালন করুন, হজ্জ পালনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

❖ অন্তরের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন, কারণ 'নিয়তের ওপর 'আমল নির্ভরশীল'। সকল প্রকার শির্ক ও বিদআত সম্পর্কে জানুন ও তা থেকে মুক্ত হয়ে চলুন।

❖ হজ্জের যাত্রা জীবনে একবারই মনে করুন। সুতরাং এ যাত্রাকে নিজের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

❖ সুখ্যাতি, ব্যবসা, ভ্রমণ বা শুধু মাহরাম হওয়ার উদ্দেশ্যে হজ্জ করবেন না।

❖ আন্তরিকভাবে অতীতের সকল পাপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করুন ও ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে পাপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প নিন।

❖ দেনমোহরসহ আপনার অন্যান্য সকল পাওনা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করুন।

❖ আপনার হজ্জের জন্য অর্থ সংগ্রহ করুন এবং নিশ্চিত করুন তা হালাল পথে উপার্জিত হয়েছে। অবৈধ বা সুদ মিশ্রিত টাকা হজ্জ কবুল হওয়ার অন্তরায়।

❖ ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করুন।

❖ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছে মিথ্যা বলা, খারাপ আচরণ, হক্ব নষ্ট করা ও তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন।

❖ এটিই আপনার জীবনের সর্বশেষ যাত্রা হতে পারে, সুতরাং আপনার পরিবারের জন্য একটি উইল বা ওসীয়তনামা করে রেখে যান।

❖ হজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও সহীহ বই থেকে জানুন এবং হজ্জের কিছু দু'আ মুখস্থ করুন।

❖ আগে হজ্জ করেছেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হজ্জ সম্পর্কে জানুন।

❖ নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখুন। (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করুন, বেশি বেশি হাঁটাহাঁটি করুন, ব্যায়াম করুন ও নিয়মিত চিকিৎসা নিন)

❖ মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন। (ধৈর্যশীল হতে শিখুন, নিজেকে মানিয়ে নিতে, রাগকে দমন করতে ও ত্যাগ শিকার করতে শিখুন)

❖ আপনার মাঝে পরিবর্তন আনুন– আপনার মুখ, চোখ, হাত, পা ও কান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন। নিজকে সংযত করুন।

❖ ধার্মিক, সহায়ক ও বিশ্বস্ত এরকম ২/১ জনকে সঙ্গী হিসেবে হজ্জ যাত্রার জন্য খুঁজে নিন এবং তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন।

❖ সম্ভব হলে দরকারী কিছু ইংরেজি, আরবি ও হিন্দি শব্দের অর্থ শিখে নিন।

❖ আপনার হজ্জের যাত্রার পরিকল্পনা করুন, প্রথমে মক্কা না মদীনা গেলে উত্তম হয় –তা ভেবে দেখুন।

❖ দাঁড়ি রেখে দেওয়ার ব্যাপারে ভাবুন; কারণ তা রাখা ওয়াজিব, কাটা হরাম, দাঁড়ি না রাখলে কবিরা গুনাহ হয় এবং ধূমপান, জর্দা ও গুল-এর মতো হারাম অভ্যাসগুলো পরিহার করুন।

❖ সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে আন্দোলিত রাখার অভ্যাস করুন।

❖ হজ্জ সফরে আবেগ তাড়িত হয়ে কোনো কিছু না করার বিষয়ে সজাগ থাকুন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আপনার মনে তাক্বওয়া অর্থাৎ- আল্লাহভীতি ও ধর্মনিষ্ঠা আনতে হবে। আপনার তাক্বওয়াকে জাগ্রত করুন।

হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি :

❖ হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্রই পাসপোর্ট করে নিন।

❖ হজ্জ সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশনার খোঁজ খবর রাখুন এ ওয়েব সাইট থেকে www.hajj.gov.bd।

❖ বিগত হাজীদের কাছ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির সেবা সম্পর্কে মতামত নিন (ঢাকায় হজ্জ মেলায় যেতে পারেন)।

❖ বেসরকারি বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সির খোঁজ নিন এবং প্যাকেজ সম্পর্কে জানুন।

❖ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবার থেকে যারা হজ্জে যাবেন তারা কম দামি হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না, কারণ সস্তার তিন অবস্থা।

❖ আর ধনীরাও ৪/৫ তারকা হোটেলের হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না। কারণ, এটা হলিডে ট্যুর নয়।

❖ অঅনুমোদিত হজ্জ এজেন্সি থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ, এতে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

❖ সরকারি ব্যবস্থাপনা অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো একটি বেসরকারি হজ্জ এজেন্সি যারা গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত 'আকীদাহ্ মুক্ত বিজ্ঞ হক্বপন্থী আলেম দ্বারা পরিচালিত তাদের হজ্জ প্যাকেজ বেছে নিন। আপনার হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

❖ তাদের হজ্জ সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন ও সেবার লিখিত বিবরণ রাখুন এবং তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

❖ সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে ১৫ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ১০ কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন ছবি করুন।

❖ হজ্জ ফরম পূরণ করুন এবং হজ্জ চুক্তি স্বাক্ষর করে এর মূল কপি ও একটি করে ফটোকপি রেখে দিন।

❖ সরকারি অথবা বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিয়ে এজেন্সির অফিস থেকে পাকা জমা রসিদ সংগ্রহ করুন।

❖ সবচেয়ে ভালো হয় আগেভাগেই কম দামে কিছু সৌদি রিয়াল কিনে নেওয়া।

❖ জানাযা সালাত কিভাবে পড়তে হয় ও জানাযার সালাত-এর দু'আ শিখে নিন।

❖ হজ্জে যাওয়ার আগে মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায়ের নিয়মকানুন শিখে নেওয়া ভালো।

❖ আপনি যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করুন।

❖ লিফট ও এস্কেলেটরে চড়ার অভ্যাস করুন।

❖ হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে মেডিক্যাল বোর্ডে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।

❖ মনিংজাইটিস টিকা নিতে হবে, ঢাকার হজ্জ ক্যাম্প থেকেও নেওয়া যাবে।

❖ বয়স ৪০/৪৫-এর নিচে হলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে থাকে সাধারণত।

❖ কিছু হজ্জ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিন এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ ভিডিও দেখুন।

❖ **ভালো হজ্জ এজেন্সি পছন্দ করার জন্য টিপস :** নন-হিলটপ বাড়ি (পাহাড়ের উপর বাড়ি না), মসজিদের নিকটবর্তী বাড়ী, তিন বেলা খাবার ব্যবস্থা, আরাফা ও মিনায় খাবারের ব্যবস্থা, হাদীর ব্যবস্থা, ভালো বাস সার্ভিস, দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারত সুবিধা ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলো হজ্জের সময় হাজীদের কেমন সেবা দেন। তাদের কাছে প্রত্যাশা কম করবেন। তাদেরকে সত্য বলার পরামর্শ দেবেন। তারা নূন্যতম কী কী সেবা দিতে পারবে আর কী কী পারবেন না, তা যেন তারা পরিষ্কার লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। কোনো লুকোচুরি যেন না থাকে। তারা যেন এমন কোনো বিষয় গোপন না করেন যা হজ্জের সময় আপনার কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় আপনার হজ্জ এজেন্সি প্রত্যাশিত কিছু সেবা নাও দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে এজেন্সির লোকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন না। এক্ষেত্রে ধৈর্যের পরিচয় দিন। ❑

কিশোর ভুবন

পাহাড়ের গুহায় বিপদগ্রস্ত তিন ব্যক্তি

–আবু তাসনীম*

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। তবে সর্বাবস্থায় একজন মু'মিনের কর্তব্য হলো– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিদায়ক কাজে অবিচল থাকা। তাছাড়া বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সৎকর্মের ভূমিকা অনেক। নিয়মিত মহান আল্লাহর পছন্দনীয় সৎকর্ম দ্বারা বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ৩ ব্যক্তি ঘুরতে বের হয়ে বিপদে পড়ে যায়। তারা ৩ জনই ছিলেন মহান আল্লাহর 'ইবাদতকারী বান্দা। তারা তাদের 'আমলের ওসীলায় সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। **ঘটনাটি নিম্নরূপ–**

পূর্বের যুগের লোকদের মাঝে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মাঝে পড়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিলো। তখনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল।

তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহর শপথ! এখন সত্য ব্যতীত আর কিছুই তোমাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সে জিনিসের ওসীলায় দু'আ করা দরকার, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে।

তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো যে, আমার একজন চাকর ছিল। সে এক ফারাক চালের বদলে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেয়নি। আমি তার মজুরি দিয়ে কিছু একটা করতে ইচ্ছা করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বদলে আমি একটি গাভী ক্রয় করলাম। অনেক দিন পর সে মজদুরটি আমার কাছে এসে তার মজুরি দাবি করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীগুলোর দিকে তাকাও এবং তা তাড়িয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিলো, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার নিকট মাত্র এক ফারাক চাল পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীগুলো নিয়ে যাও। কারণ (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বদলে এটি ক্রয় করা হয়েছে। তখন সে গাভীগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি কিছুটা সরে গেল।

দ্বিতীয় যুবক দু'আ করল, হে আল্লাহ! তোমার ভালো করে জানা আছে যে, আমার পিতা-মাতা খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রত্যেক রাত্রে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি বিলম্ব করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে ক্ষুধায় ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার পিতা-মাতাকে দুধ পান না করানো পর্যন্ত আমার (ক্ষুধায় কাতর) ছেলে মেয়েকে দুধ পান করাইনি। কারণ তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটা আমি ভালো মনে করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভালো লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) সকাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের জাগার অপেক্ষা করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এটা করেছি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতঃপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আকাশ দেখতে পেল।

সর্বশেষ এক যুবক দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে (যৌন মিলনের) ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশত দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজি হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার কাছে আসলাম এবং এ একশ' দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। তখন সে নিজেই নিজকে আমার কাছে সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, মহান আল্লাহকে ভয় করো এবং (শরিয়তের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ব্যতীত আমার সতীত্বকে নষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিলাম এবং একশত দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জানো যে, আমি প্রকৃতই তোমার ভয়ে তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের হতে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা বেরিয়ে আসল।[১১০]

শিক্ষণীয় বিষয় : ১. সৎ 'আমলের বিনিময়ে বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়। **২.** মজুর তার মজুরি যথাসময়ে না নিলে পরে যদি সে আসে তাহলে তাকে অবশ্যই দিতে হবে। **৩.** আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতা-মাতার হক্বের ব্যাপারে খেয়াল রাখা। **৪.** মহান আল্লাহর ভয় যার মধ্যে রয়েছে সে কখনো যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হবে না। ❑

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[১১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৬৫।*

কবিতা

আমার হারিয়ে যাওয়া

মো. আব্দুল হাই

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছি
উচ্ছল, প্রাণবন্ত, স্বপ্নভুক এই আমি,
নিষ্প্রভ, নিস্তরঙ্গ, নিশ্চুপ নিরিবিলিতে,
রাতের নিশাচর হয়ে।
এ আমার ভালো লাগায় নয়।
হতাশার সাময়িক মূর্ছনায় জেগে থাকতে হয় জীবিকার চাপে,
অস্থির, অসুস্থ পৃথিবীতে বাঁচার এক দুর্গম প্রতিযোগিতায়।
অস্পৃশ্য অদম্য আকাঙ্ক্ষায়, অসম্ভব মনো-বাসনায়।

কি অদ্ভুত জীবন আমার!
খুব সামান্য! খুব সামান্যই চাওয়া ছিল,
এই তো; একটু খেয়ে পরে বাঁচা,
আর সম্মান নামক দুর্লভ বস্তুটিকে নিয়ে
সমাজে মনুষ্যরূপে টিকে থাকার প্রচেষ্টায়,
হা হা হা! সেখানেও বাঁধা যখন
টিকে থাকার ব্যর্থ স্বপ্নে।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় থেমে নেই জীবন যাত্রা,
সময়ের নিরবচ্ছিন্ন তাড়নায় শুধুই সামনে
দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি,
মরীচিকাসম সূর্যোদয়ের অপেক্ষা নিয়ে।
যদিও ঘনকালো মেঘের আড়ালে সে আশা বড়ই ক্ষীণ।
তবুও জীবন সংগ্রামের ব্যস্ততম সৈনিক আমি,
সময়কে পাশ কাটিয়ে ছুটেই চলছি সেই মরীচিকার পেছনে,
অস্থির পদযাত্রায়, অনিশ্চিত গন্তব্যে।

আর এভাবেই, চলতে চলতে ক্লান্ত এই আমি,
সময়ের চোরাবালিতে হারিয়ে যাব একদিন,
অস্তগামী সূর্যের মতো। মনোকষ্টের প্রলম্বিত বিস্মরণে।
কেউ জানলো না, জানবে না হয়তো
একটি সম্ভাবনার অসময়ের বিচ্ছিন্নতায়।
সাময়িক হা হুতাশ, কিছুদিনের আলাপচারিতায়,

এরপর ঠিক নাগরিক জীবনের ব্যস্ততায়,
নগরায়নের অসহ চাপে, ভুলে গিয়ে সব
আপন ভুবনে।
এভাবেই কালের গর্ভে হারিয়েছে
লক্ষ কোটি বানী আদমের স্বপ্নযাত্রা।

ভুল

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

ভোর নিশিতে সুধাসুরে মুয়াযযিন হাঁকে;
নাউম থেকে সালাত ভালো এই বলে সে ডাকে।
পাখ-পাখালি, গাছ-গাছালি, ঘরের মোরগ ভাই;
কক্ ককিয়ে কী বলছে, তোমরা বুঝো নাই?
ঘুম ছেড়ে দাও ওযূ করে রবের ঘরে যাও;
সালাত তোমায় পড়তে হবে স্বর্গ যদি চাও।
আযান শুনে ঘরে-বাইরে বসে রইল যেজন;
তারা তো ভাই ইবলিসের, দোসর কিংবা স্বজন।
চন্দ্র, সূর্য, তরু-লতা ওরাও সিজদা করে;
আযান শুনে মুসলিম থাকে কু আড্ডায় পড়ে।
যে দিলো ভাই সুন্দর তনু সুখের সংসার;
গগনচুম্বি অট্টালিকা সম্পদের পাহাড়।
তারেই আজ ভুলে গেছ ধরণীর মায়ায়;
পাপ তরিকার হইছ পথিক শয়তানের ধোঁকায়।
রবের বিধান তিক্ত লাগে অসহ্য বোধ হয়!
পাপ কর্ম করতে কেবল লাগে সুধাময়।
সালাত বিনা দাবি করি খাঁটি মুসলমান!
সে জনমে এ দাবিটা হবে প্রত্যাখ্যান।
সত্য ছেড়ে মিথ্যার পিছে হয়েছ মশগুল;
চোখ বুজিলেই দেখতে পাবে, কী করেছ ভুল।

পরিচয়

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম

গরীব ঘরে জন্ম আমার
নেইতো ভিটাবাড়ি,
ভালো কথা বললে পড়ে
দেয় যে সকলে আড়ি।
হালাল পথে আয় করা
বড়োই কঠিন কাজ,
হারাম পথে উপার্জনে
নেই যে কোনো লাভ।
কি হবে অবৈধ অট্টালিকা গড়ে?
এ দুনিয়া ছাড়তে হবে দু-এক দিন পরে।
কি হবে ভাই বিলাসিতা ক্ষণিক জীবন তরে;
মৃত্যুর পর থাকব কোথায় সে ভাবনা করি।
গরীব আমি হতে পারি
ভিক্ষুক তো নই বটে।
দ্বীনের পথে অটুট থেকে
চলবো হক্বের পথে।

জমঈয়ত সংবাদ

সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি

সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ সদ্য সমাপ্ত রামাযানে জেলা জমঈয়তের অন্তর্গত মাহমুদপুর, বাঁকাল, গড়েরকান্দা, ইটাগাছা, বড় বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ, লাবসা, রসুলপুর, পলাশপোল, বকচরা, বাবুলিয়া, পুরাতন সাতক্ষীরা আহলে হাদীস জামে মসজিদ, সদর আহলে হাদীস জামে মসজিদ, ঘোনা, পাথরঘাটা, বুধহাটা, কাদাকাটি, ঝাউডাঙ্গা, কুশখালী, বাঁশদহা, আখড়াখোলা, মানিকহার, কলারোয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, উত্তর তলুইগাছা, দক্ষিণ তলুইগাছা, কেড়াগাছি, কাকডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া প্রভৃতি শাখায় দাওয়াহ্ ও সাংগঠনিক সফর করেন। এ সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম ও আলহাজ মাওলানা আব্দুর রহমান, সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, জেলা শুব্বান সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল গালিব, সেক্রেটারি মাওলানা হাবিবুল্লাহ বিন বাশার প্রমুখ। এছাড়াও আমন্ত্রিত ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া ঢাকার শিক্ষক শাইখ আনিছুর রহমান মাদানী ও শাইখ মুফতী আব্দুর রউফ মাদানী, অধ্যাপক আবুল খায়ের, মাওলানা মুহাম্মদ মফিজ উদ্দীন, আলহাজ খাইরুল আনাম, শাইখ হাফেয শরীফ হুসাইন মাদানী, মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, প্রফেসর মুহাম্মদ জামালউদ্দীন, আলহাজ আব্দুর রাজ্জাক, মাস্টার মুহাম্মদ আমানুল্লাহ, মাস্টার শামসুর রহমান, মাওলানা আব্দুল আলীম, হাফেয মুহাম্মদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ শওকাত হোসেন, মাস্টার বদিউজ্জামান খান, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মৌলভী রেজাউল হক, মাওলানা আহছান উল্লাহ, হাফেয আব্দুল হাদী, মৌলভী নজরুল ইসলাম, মাওলানা ইউনুস আলী, মাওলানা শাহ আলম, মাওলানা আলী হুসাইন, মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাস্টার আসাদুল ইসলাম, শাইখ মোস্তফা কামাল, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, মাওলানা অহিদুজ্জামান, মাওলানা বদরুজ্জামান প্রমুখ।

খুলনা জেলা জমঈয়তের দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি

দাওয়াহ ও সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ সদ্য সমাপ্ত রমাযানে জেলা জমঈয়তের অন্তর্গত তেরখাদা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, দিঘলিয়া, সেনহাটি প্রভৃতি এলাকায় সফর করেন। এ সফরে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রবাস ও বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ হাদী অংশগ্রহণ করেন। জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, সহ-সভাপতি শাইখ আরাফাত মাদানী ও শাইখ জালাল উদ্দিন মাদানী, জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ মঈনুল আরেফিন, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদুর রহমান হেলাল, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক শাইখ মোস্তফা কামাল, মাদ্‌রাসা আল মাহাদ আস-সালাফির অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলভি বাহারুল ইসলাম, আশরাফুল আলম বাবু, শেখ মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক আলী এহসান, মাস্টার শাহারুল ইসলাম, মাস্টার সেলিম আহমদ, মুহাম্মদ আবু বক্কর, মুহাম্মদ গোলাম হোসেন, শাইখ আরাফাত মাদানী, মুহাম্মদ জিয়াউল হক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠন

গত ৮ এপ্রিল শনিবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রবাসী শাখা মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি শাইখ ড. জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী। প্রয়োজনীয় আলোচনা ও দিকনির্দেশনার পর প্রধান অতিথি, শাখা জমঈয়তের উপদেষ্টা ড. আব্দুল মোমিন এবং পরামর্শক কমিটির উপস্থিতিতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২২৪ জন সদস্যের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ–**

উপদেষ্টা পরিষদ– শাইখ ড. হারুনুর রশিদ ত্রিশালী, শাইখ ড. আব্দুল মোমিন, শাইখ ড. শেখ সা'দী। **কার্যকরী কমিটি–** সভাপতি- শাইখ ড. জয়নুল আবেদীন বিন আব্দুর রাজ্জাক, সহ-সভাপতি- শাইখ ড. মো. রায়হান উদ্দীন, সেক্রেটারি- শাইখ মনিরুল ইসলাম বিন ইসমাইল, কোষাধ্যক্ষ- শাইখ ঈসা ওমর, সহকারী সেক্রেটারি- শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আইয়ুব, সাংগঠনিক সম্পাদক- শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আনিস, দা'ওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- শাইখ ড. যয়নুল আবেদীন, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- শাইখ শহিদুল্লাহ বিন সিরাজুল ইসলাম, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- শাইখ হাফেয হাবীবুর রহমান, পাঠাগার সম্পাদক- শাইখ সানাউল্লাহ বিন মফিজুদ্দীন, দফতর সম্পাদক- শাইখ বুরহানুদ্দীন আব্দুল গফুর, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- শাইখ হাফেয মাহদী হাসান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- শাইখ আলমগীর, সহকারী কোষাধ্যক্ষ- শাইখ হাফেয মোস্তাক ফিরোজ, সহকারী সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- শাইখ মুহাম্মদ শামীম, সদস্যবৃন্দ- শাইখ আব্দুল্লাহ ওয়াসিম, শাইখ আবু তাহের, শাইখ ইমরুল কায়েস, শাইখ মাসউদ, শাইখ ফজলে রাব্বী বিন সোলায়মান, শাইখ আনোয়ার সাদাত বিন কেরামত আলী।

শুব্বান সংবাদ

শুব্বানের অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গত ১২ মে শুক্রবার কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও 'অনলাইন বই পাঠ প্রতিযোগিতা'র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী মিলনায়তনে বাদ মাগরিব প্রোগ্রাম শুরু হয়। মাসিক আলোচনা সভায় আলোচনার বিষয় ছিল– "ইসলাম প্রচারে আলেম সমাজের অবদান"। শেকড় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদের সদস্য হাফেয শাহীন সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং প্রদান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম।

আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের পরিকল্পনা সম্পাদক মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মদ মশিউর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ হেদায়াতুল্লাহ, মজলিসে আম সদস্য মুহাম্মদ তাকিউদ্দীন, মুহাম্মদ নাজিবুল্লাহ, মুহাম্মদ তাওহীদ বিন হেলাল, আবু লায়েস ফাহিম, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী মুহাম্মদ জাহিদ হাসান (কুমিল্লা), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুরের ছাত্র মো. দেলোয়ার হোসেন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), তৃতীয় স্থান অধিকার করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী নাজমুল হোসেন (নোয়াখালী)। এছাড়াও সকল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হাফিয আব্দুল ওয়াদুদ গাজী।

উল্লেখ জামঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ শেসাস এর উদ্যোগে রমাযান মাসব্যাপী কুরআন তিলাওয়াতের আসর এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে হাদিয়া হিসেবে রুমাল ও টুপি প্রদান করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

০১) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ বিন শাহেদ আল মাদানীর বাবা মোহাম্মদ শাহেদ আলী (৯০) গত ০৭ মে, রবিবার 'আসরের পর মৃত্যুবরণ করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার জানাযায় ইমামতি করেন মাইয়্যেতের জ্যেষ্ঠপুত্র শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী। অতঃপর তাকে ময়মনসিংহ জেলার আন্দারিয়াপাড়া গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের-এর পক্ষ হতে মাইয়িতের মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন ও শোক-সন্তপ্ত পরিরারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

০২) ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন গত ২৬ এপ্রিল, বুধবার মৃত্যুবরণ করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিমকে দুআ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

দু'আর আবেদন

সাপ্তাহিক আরাফাতের নিয়মিত পাঠক ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের মুসল্লি এ. কে. এম. ফজলুর রহীম বেশ কয়েকদিন থেকে বার্ধক্যজনিতসহ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। তার আরোগ্য লাভের জন্য মহান আল্লাহর নিকট সকলকে দুআ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

গরমের বিপদ হিটস্ট্রোক

গরমের দিনে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত একটি সমস্যার নাম হিটস্ট্রোক। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী, প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫০ ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে তাকে হিটস্ট্রোক বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। কোনো কারণে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ত্বকের রক্তনালি প্রসারিত হয় এবং অতিরিক্ত তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে ঘামের মাধ্যমেও শরীরের তাপ কমানো হয়। কিন্তু প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র পরিবেশে অনেকক্ষণ থাকলে বা পরিশ্রম করলে তাপ নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব হয় না। এতে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বিপৎসীমা ছাড়িয়ে যায় এবং হিটস্ট্রোক দেখা দেয়।

হিটস্ট্রোক কাদের বেশি হয়?

প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতায় যে কারোরই হিটস্ট্রোক হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিটস্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। যেমন- ● শিশু ও বৃদ্ধের তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম থাকায় হিটস্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। এছাড়া বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায়ই অন্যান্য রোগে ভুগে থাকেন কিংবা নানা ওষুধ সেবন করেন, যা হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। ● যাঁরা রোদের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করেন, তাঁদের ঝুঁকি বেশি। যেমন- কৃষক, শ্রমিক ও রিকশাচালক। ● শরীরে পানিস্বল্পতা হলে ঝুঁকি বাড়ে। ● কিছু কিছু ওষুধ হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষ করে, প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ, বিষণ্নতার ওষুধ, মানসিক ব্যাধির ওষুধ ইত্যাদি।

হিটস্ট্রোকের লক্ষণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে হিটস্ট্রোকের আগে অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক হিট ক্র্যাম্প অথবা হিট এক্সাসশন হতে পারে। হিট ক্র্যাম্পে শরীরের মাংসপেশি ব্যথা করে, দুর্বল লাগে এবং প্রচণ্ড পিপাসা লাগে। এর পরের ধাপে হিট এক্সাসশনে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথাব্যথা, ঝিমঝিম করা, বমিভাব, অসংলগ্ন আচরণ ইত্যাদি দেখা দেয়। এই দুই ক্ষেত্রেই শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকে এবং শরীর প্রচণ্ড ঘামতে থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে হিটস্ট্রোক হতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো– ● তাপমাত্রা দ্রুত ১০৫০ ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। ● ঘাম বন্ধ হয়ে যায়। ● ত্বক শুষ্ক ও লালাভ হয়ে যায়। ● নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। ● নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। ● রক্তচাপ কমে যায়। ● খিঁচুনি, মাথা ঝিমঝিম করা, অস্বাভাবিক ব্যবহার, হ্যালুসিনেশন, অসংলগ্নতা ইত্যাদি। ● প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। ● রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়; এমনকি শকেও চলে যেতে পারে।

প্রতিরোধের উপায় : গরমের দিনে কিছু সতর্কতা মেনে চললে হিটস্ট্রোকের বিপদ থেকে বেঁচে থাকা যায়। এগুলো হলো– ● হালকা, ঢিলেঢালা কাপড় পরুন। কাপড় সাদা বা হালকা রঙের হতে হবে। সুতি কাপড় হলে ভালো। ● যথাসম্ভব ঘরের ভেতর বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকুন। ● বাইরে যেতে হলে চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি বা ছাতা ব্যবহার করুন। বাইরে যাঁরা কাজকর্মে নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা ছাতা বা কাপড়-জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে পারেন। ● প্রচুর পানি ও অন্যান্য তরল পান করুন। মনে রাখবেন, গরমে ঘামের সঙ্গে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। তাই পানির সঙ্গে সঙ্গে লবণযুক্ত পানীয় যেমন-খাওয়ার স্যালাইন, ফলের রস, লাচ্ছি ইত্যাদিও পান করতে হবে। পানি অবশ্যই ফোটানো হতে হবে। ● তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পানীয় যেমন- চা ও কফি যথাসম্ভব কম পান করা উচিত। ● রোদের মধ্যে শ্রমসাধ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। এসব কাজ সম্ভব হলে রাতে বা খুব সকালে করুন। যদি দিনে করতেই হয়, তবে কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিতে হবে এবং প্রচুর পানি ও স্যালাইন পান করতে হবে।

আক্রান্ত হলে করণীয় : প্রাথমিকভাবে হিটস্ট্রোকের আগেই যখন হিট ক্র্যাম্প বা হিট এক্সাসশন দেখা দেয়, তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই যা করতে পারেন, তা হলো– ● দ্রুত শীতল কোনো স্থানে চলে যান। ফ্যান বা এসি ছেড়ে দিন। ● ভেজা কাপড়ে শরীর মুছে ফেলুন। সম্ভব হলে গোসল করুন। ● প্রচুর পানি ও খাওয়ার স্যালাইন পান করুন। চা বা কফি পান করবেন না। যদি হিটস্ট্রোক হয়েই যায়, রোগীকে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে, ঘরে চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে রোগীর আশপাশে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের করণীয় হলো– ● রোগীকে দ্রুত শীতল স্থানে নিয়ে যান। ● গায়ের কাপড় খুলে দিন। ● শরীর পানিতে ভিজিয়ে দিয়ে বাতাস করুন। এভাবে তাপমাত্রা কমাতে থাকুন। ● সম্ভব হলে কাঁধে, বগলে ও কুঁচকিতে বরফ দিন। রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে খাওয়ার স্যালাইন দিন। ● দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সব সময় খেয়াল রাখবেন, হিটস্ট্রোকে অজ্ঞান রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ি চলছে কি-না। প্রয়োজন হলে কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস ও নাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করতে হতে পারে। হিটস্ট্রোকে জীবন বিপদাপন্ন হতে পারে। তাই এই গরমে এর থেকে সতর্ক থাকুন। *[সূত্র : প্রথম আলো অনলাইন]*

তীব্র গরমে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং করণীয়

রোদ এবং গরমের তীব্রতার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগ এবং স্বাস্থ্যসমস্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গরমে প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো আর গেলেও সাথে ছাতা এবং পানির বোতল রাখতে হবে। বাসায় বয়স্ক এবং বাচ্চাদের আলাদা যত্ন নিতে হবে। তীব্র গরমে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং করণীয় কি তা নিম্নরূপ :

১. পানিশূন্যতা : এই গরমে সবথেকে বেশি যে সমস্যা হয় সেটা হলো পানিশূন্যতা। তীব্র গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায়, সেই সাথে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকার

কারণে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে দেখা দেয় পানিশূন্যতা। এই গরমে পানিশূন্যতা থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পানি বা তরল খাবার খেতে হবে, সেই সাথে বাইরে গেলে অবশ্যই ছাতা এবং পানির বোতল সাথে রাখতে হবে। যতটা সম্ভব বাইরের পানীয় এবং খাবার পরিহার করতে হবে।

২. মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি : তীব্র গরমে অনেকের শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রচণ্ড গরমে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় যেটা তীব্র মানসিক স্বাস্থ্য সংকটের সম্মুখীন করে। গরমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে প্রয়োজনীয় ঘুম দরকার। অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও উদ্বেগ নেয়া যাবে না। বেশি বেশি পানি বা পানিজাতীয় খাবার খেতে হবে।

৩. হিটস্ট্রোক : সাধারণত অতিরিক্ত রোদে থাকার কারণে হিটস্ট্রোক হয়ে থাকে। হিটস্ট্রোক হলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪ ডিগ্রি বা তার বেশি হতে পারে সেই সাথে শরীর পানিশূন্য হয়ে যায়। বয়স্কব্যক্তি, শিশু, যারা কায়িক শ্রম করেন, হৃদরোগী এবং ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, ক্রীড়াবিদদের সাধারণত হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি থাকে। হিটস্ট্রোকের **লক্ষণগুলো** জেনে নেয়া ভালো– ● শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। ● দ্রুত হৃদস্পন্দন এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। ● বিভ্রান্তি এমনকি খিচুনিও হতে পারে, এলোমেলো আচরণ। ● তীব্র মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব। ● মাংসপেশী ক্রাম্প বা দুর্বলতা। ● ত্বকে ফুসকুড়ি, অতিরিক্ত ঘাম/ ঘাম না হওয়া। ● অবচেতন হয়ে যাওয়া।

করণীয় : ● দ্রুত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সরিয়ে নিতে হবে। ● চোখে, মুখে এবং ঘাড়ে পানি দিতে হবে তবে গোসল করানো গেলে ভালো হয়। ● প্রচুর পরিমাণ পানি পান করাতে হবে। ● ফ্যান/এসির নিচে রাখলে ভালো হয়। ● অবস্থার উন্নতি না হলে সময় নষ্ট না করে হাসপাতালে নিতে হবে।

৪. চর্মরোগ : অতিরিক্ত গরমে যাদের ঘাম বেশি হয় তাদের শরীরে চর্মরোগ দেখা দেয়া, যেমন- ঘামাচি/ছত্রাক সংক্রমণ। অনেকেই ঘামাচি হলে সেখানে চুলকায় এবং সংক্রমণের সৃষ্টি হয়। ঘামাচি থেকে রক্ষা পেতে ঘামে ভেজা জামাকাপড় পরেরদিন না ধুয়ে পরা উচিত না।

৫. ডায়রিয়া/বদহজম : অতিরিক্ত গরমে অনেকের হজমে সমস্যা দেখা দেয়। গরমে খাবার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় যেটা খেলে ফুডপয়জনিং বা বিষক্রিয়া হতে পারে। তাই পচা-বাসি খাবার, রাস্তাঘাটের খোলা খাবার, লেবুর শরবৎ, আখের রস এসব না খাওয়াই ভালো এবং ফ্রিজের খাবার খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে গরম করে নিতে হবে। ডায়রিয়া হলে প্রচুর পরিমাণ পানি, স্যালাইন ও ডাবের পানি খেতে হবে। *[সূত্র : সময় টিভি।*

গরমে শিশুর যত্ন নিবেন যেভাবে

গরমে বড়দের থেকে শিশুদের বেশি কষ্ট হয়। গরমে শিশুরাই বেশি ঘেমে যায়। তাই এই সময় বাবা-মায়েরা শিশুদের নিয়ে একটু বেশিই চিন্তিত থাকে। আর গরমে শিশুরাই বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। এ কারণে গরমে ছোট সোনামণিদের বিশেষ যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। তাদের খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই খেয়াল রাখতে হবে। এই গরমে কি কি উপায়ে শিশুর সঠিক পরিচর্যা করা সম্ভব তা নিম্নে দেওয়া হলো–

শিশুর খাদ্য : গরমে শিশুদের খাদ্য তালিকায় হালকা, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাবার রাখতে হবে। সেটা হতে হবে অবশ্যই নরম খাবার। তবে খেয়াল রাখতে হবে গরমে শিশুদের খাবার যাতে বাইরের না হয়। ঘরেই সহজপাচ্য খাবার বানিয়ে শিশুকে খাওয়ান। গরমের দিন মাছ-মাংস একটু কম করেই খাওয়ানো উচিত। গরমে শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা পানি পান করান। কেননা এ সময় শিশুরা খুবই ঘেমে যায়। এতে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ঝরে যায়। তবে খেয়াল রাখবেন পানি যেন ফ্রিজের না হয়। এছাড়া গরমকালে বিভিন্ন রসালো ফল পাওয়া যায়। শিশুদের অবশ্যই গরমে এসব ফল খাওয়াবেন। ফলের জুসও খাওয়াতে পারেন।

শিশুদের পোশাক : গরমে আপনার শিশুর পোশাকের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। গরমের দিনগুলোতে শিশুকে সুতির নরম ও পাতলা পোশাক পরান। হাতা কাটা পোশাক পরানো প্রয়োজন। ডিসপোজেবল ন্যাপির পরিবর্তে সুতির পাতলা কাপড়ের ন্যাপি পরানো ভালো। কেননা ডিসপোজেবল ন্যাপিগুলো ঘাম ও তাপ শোষণ করতে পারে না তাই র‍্যাশ, ঘামাচি প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নিয়মিত গোসল : গরমে শিশুদের খুব দ্রুত র‍্যাশ ও ঘামাচি উঠে। তাই গরমের দিনে শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে। গোসলের সময় ভাঁজযুক্ত জায়গা যত্ন সহকারে পরিষ্কার করতে হবে। গোসলের পানিতে ডেটলও দিতে পারেন।

শিশুর চুলের যত্ন : এই গরমে আদরের ছোট্ট সোনামণির চুলের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। গরমে শিশুর বেশিরভাগ চুলের গোড়া ঘেমে যায়। এতে মাথায় খুশকি ও ঘামাচি বের হয়। তাই গরমের শুরুতেই শিশুর চুল ছোট রাখতে হবে। ন্যাড়া করে দিলে আরও ভালো হয়।

শিশুর আবাসস্থল : গরমে শিশুকে ঠান্ডা রাখার জন্য ঘরে যেন প্রচুর আলো-বাতাস ঢুকতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। দম বন্ধ করা ঘরে রাখলে শিশু অসুস্থ হয়ে যাবে। তাই বলে ঠান্ডার জন্য এসি ব্যবহার করা যাবে না। মাঝে মাঝে আপনার শিশুকে বারান্দায় নিয়ে যাবেন।

শিশুর প্রসাধনী : গরমে শিশুকে গোসলের পর তেল, লোশন প্রভৃতি প্রসাধনীর ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। শিশুকে গোসল করানোর পর শরীর শুকিয়ে আসলে গলা, পায়ের ভাঁজে ইত্যাদিতে পাউডার ব্যবহার করুন। এতে ঘামাচি ওঠা রোধ করবে।

শিশুর স্বাস্থ্য : শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। শিশুর সুস্থতার জন্য ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। কোনো রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। *[সূত্র : একুশে টেলিভিশন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমরা অনেক পূর্ব থেকেই 'ফিতরা' টাকার মাধ্যমে আদায় করে আসছি। বর্তমানে অনেকে এই বিষয়ে 'প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে 'ফিত্‌রা' আদায়ের ব্যবস্থা' করার জন্য অভিমত পোষণ করছেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আমরা 'ফিত্‌রা' কি টাকার অংকে; না প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করবো', তা শরিয়তসম্মত বিধানসহ সবিস্তারে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।*

হাজী মোহাম্মদ আলী
গাইবান্ধা সদর উপজেলা, গাইবান্ধা।

জবাব : বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহুল বুখারীতে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিশমিশ ও পনির।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফিতরা হচ্ছে এক সা' পরিমাণ খাদ্য, হা. ১৫০৬)*

এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এরকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আমাদের জানা নেই। তবে গমও খাদ্যদ্রব্য হওয়ায় তা দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

"রোযাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাতুল ফিত্‌র ফর্‌য করেছেন।" *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : যাকাত, হা. ১৬০৯, হাসান)*

টাকা দিয়ে ফিত্‌রা আদায় সম্পর্কিত হাসান বাসরীর বর্ণনাটি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বায় এসেছে। এতে উল্লেখ আছে যে, 'উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) অর্ধ সা'-এর মূল্য দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করার রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করেছিলেন। এটা সহীহ হলেও রাসূল (ﷺ) থেকে সহীহ মারফু হিসেবে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে তা 'আমলযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)-কে যখন বলা হলো যে, লোকেরা তো বলছে যে, 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয টাকা দিয়ে ফিত্‌রা চালু করেছেন, তখন তিনি বলেন : তারা রাসূল (ﷺ)-এর কথা বাদ দিচ্ছে এবং বলছে অমুক এটা বলেছে, অমুক এটা বলেছে। মোটকথা, রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের মোকাবেলায় হাসান বসরী কিংবা 'উমার ইবনু 'আব্দিল 'আযীয বা অন্য কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

জিজ্ঞাসা (০২) : *একজন নারীর জন্য যদি তার মায়ের আপন মামা ও চাচা মাহরাম হয়, তাহলে কী তার সৎ মায়ের আপন মামা ও চাচা এবং সৎ মায়ের আপন ভাই (আমার সৎ মামা) কী মাহরাম হবে?*

মো. বাপ্পী মিয়া
গোপালগঞ্জ।

জবাব : আপনার সৎ মায়ের মামার সাথে আপনার রক্তের সম্পর্ক না থাকায় সে আপনার মাহরাম নয়। অতএব তার সাথে শরিয়তের পর্দার বিধান মেনে চলা আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *জামে' আত্ তিরমিযী'র ১১০১ নং হাদীসে আছে– ওলী ছাড়া বিবাহ বাতিল। আবার জামে' আত্ তিরমিযী'র ১১৮৪ নং হাদীসে আছে– তিনটি জিনিস ঠাট্টাচ্ছলে বলল ও সত্য, তার মধ্যে বিবাহ একটা। এখন একজন নারী যদি তার বান্ধবীকে ঠাট্টা করে বলে 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম' আর সে যদি ঠাট্টা করে বলে 'আমি কবুল করলাম'। এরপর তারা আলাদা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে লাগল। এখন শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি কি বিয়ে বলে গণ্য হবে, না বিয়েই সংঘটিত হয়নি? ওই মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিতে কি তাদের মধ্যে তালাকের প্রয়োজন হবে?*

সিয়াম, বেরাইদ, ঢাকা।

জবাব : আপনার প্রশ্নটি সঠিক হয়নি। কারণ, আপনি প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন যে, **একজন নারী যদি তার বান্ধবীকে ঠাট্টা করে বলে 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম' আর সে যদি ঠাট্টা করে বলে 'আমি কবুল করলাম'**। এটা জানা কথা যে, কোনো নারী তার বান্ধবীকে বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ হয়ে থাকে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে; নারীতে নারীতে এবং পুরুষে পুরুষে বিবাহ করা ইসলামী শরিয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সম্ভবত আপনি বলতে চেয়েছিলেন, একজন পুরুষ যদি তার বান্ধবীকে ঠাট্টা করে কথাটি বলে। যদি এ রকম হয়, তাহলেও বৈধ বিবাহ সম্পন্ন হবে না। কারণ, মেয়ের ওয়ালী ছাড়া বিবাহ সহীহ হয় না। অতএব জামে' আত্ তিরমিযী'র হাদীসের অর্থ হচ্ছে কোনো মেয়ের শরিয়ত সম্মত অভিভাবক যদি কোনো পুরুষকে হাসি-ঠাট্টা করে বলে, আমি আমার অমুক মেয়ে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম এবং উদ্দিষ্ট পুরুষ যদি বলে আমি কবুল করলাম, তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিয়ে যেহেতু সম্পন্ন হয়ে যাবে, তাই এর যাবতীয় হুকুম-আহকামও কার্যকর হবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : *আমাদের এলাকায় প্রতি বছর হাট-বাজারের মুসলিম অমুসলিম দোকানদারদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে মাহফিল বা ওয়াজ অনুষ্ঠান করা হয়, সে ওয়াজ মাহফিলে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, ওয়াজিনকে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় হাজার হাজার টাকা দেওয়া হয়, এর যৌক্তিক কোনো দলিল আছে কি? দয়া করে জানাবেন।*

মো. ফকরুল ইসলাম
মাহিলাড়া, গৌরনদী, বরিশাল।

জবাব : হাট-বাজারের দোকানদারগণ যদি কোনো প্রকার চাপাচাপি ও জবরদস্তি ছাড়াই খুশিমনে ওয়াজ মাহফিলের জন্য টাকা-পয়সা দান করে, তাহলে সেই টাকা দিয়ে ওয়াজ মাহফিল করা জায়িয আছে। কিন্তু যদি জানা যায় যে, মাহফিল বা বাজার কর্তৃপক্ষ দোকানদারদের মনে কষ্ট দিয়ে টাকা আদায় করে থাকে, তাহলে সেটা বৈধ হবে না। এ রকম ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে কোনো বরকতও হবে না। সেই সঙ্গে এ জাতীয় মাহফিলে যেসব বক্তা ওয়াজ করেন, তাদের উচিত কর্তৃপক্ষকে নসীহত করা এবং এ জাতীয় মাহফিল থেকে অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

জিজ্ঞাসা (০৫) : *নানা শ্বশুর, দাদা শ্বশুর, চাচা শ্বশুর ও মামা শ্বশুর উনারা কী মাহরাম?*

মো. বাপ্পী আহমেদ
গোপালগঞ্জ।

জবাব : কোনো মহিলার স্বামীর পিতা যেমন তার জন্য মাহরাম, অনুরূপ স্বামীর দাদা বা নানাও তার জন্য মাহরাম। কিন্তু স্বামীর চাচা কিংবা মামা অর্থাৎ- মহিলার চাচা শ্বশুর কিংবা মামা শ্বশুর মহিলার জন্য মাহরাম নয়। অতএব মহিলাগণ স্বামীর চাচা কিংবা মামার সামনে শরিয়তের পর্দার বিধান মেনে চলবে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : *মো. ইয়াহইয়া নাম কি ভালো? নামের সঠিক বানান কি?*

মো. ইয়াহইয়া, মাধবকাটি, সাতক্ষীরা।

জবাব : ছেলে সন্তানের ইয়াহইয়া নাম রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) ছিলেন বানী ইসরাঈলের একজন মর্যাদাবান নবী। তিনি ছিলেন যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র। নবীদের নামে ছেলে সন্তানদের নাম রাখা খুবই উত্তম। ইয়াহইয়া নামটি আপনি বাংলা উচ্চারণের মাধ্যমে যেভাবে লিখেছেন, সেটাই সঠিক মনে করি। আরবীতে লিখলে এভাবে হবে, يحيى।

জিজ্ঞাসা (০৭) : *আমি বিয়ের আগে ও পরে অনেক গুনাহ করেছি। কিন্তু ৮ বছর আগে আমি আমার স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছি, তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে সংসার জীবন সুন্দরভাবে পালন করছি। এখন আমাদের বৈবাহিক জীবনের ১০ বছর। আমার স্ত্রীর সাথে মাঝে মধ্যে ছোটখাটো বিষয়টি ঝগড়া হলে বা আমার গুনাহর কথা মনে পড়লে আমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে এবং আমাকে সন্দেহ করে। আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করি। আরো সে রেগে আমাকে যা তা কথা শুনাতে থাকে। তখন আমিও ধৈর্য্য হারা হয়ে ঝগড়া করি। কারণ আমি আমার সংসার জীবন সুন্দর করে পালন করে আসছি ও ভবিষ্যতেও যাতে আমাদের সুখের সময়ে দিন কাটে সেইদিকে লক্ষ্য করি। এতে আমার করণীয় কি? আমি আমার স্ত্রীকে কিভাবে বুঝাবো? সুন্দর পরামর্শের আশা করছি।*

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোলদিঘি, কক্সবাজার।

জবাব : আপনি যেহেতু বিয়ের আগে ও পরে মহান আল্লাহর হক্ব সম্পর্কিত গুনাহ করেছেন, তাই আপনার উপর আবশ্যক ছিল কেবল মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অপরাধ গোপন রাখা। আপনি যেহেতু মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন ও সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন, তাই আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে অপরাধ স্বীকার করে ও ক্ষমা চেয়ে ভুল করেছেন এবং একটি অপ্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। আর ভুলটি যেহেতু করেই ফেলেছেন, তাই এখন আপনার কলাকৌশল ও সুন্দর আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকে বুঝনোর চেষ্টা করুন। আর তার সাথে যতদূর সম্ভব ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। –আল্লাহ সহায়।

জিজ্ঞাসা (০৮) : *মসজিদে 'আসরের সালাতের জামা'আত হচ্ছে, কিন্তু আমি যোহরের সালাত আদায় করিনি। এমতাবস্থায় আমি যোহরের নিয়ত করে ঐ জামা'আতে শরিক হব, এভাবেই আমার জানা। আমার প্রশ্ন হলো– মসজিদে 'ইশার জামা'আত শুরু হয়েছে, কিন্তু আমার মাগরিব এখনো আদায় হয়নি। এখন কি আমি মাগরিবের নিয়তে 'ইশার জামা'আতে শরিক হবো? নাকি 'ইশা পড়ার পর মাগরিব পড়ব?*

আবু বকর, শার্শা, যশোর।

জবাব : আলেমদের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতে, আপনি মাগরিবের নিয়তেই 'ইশার ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। আপনি যদি সালাতের প্রথম থেকেই দাঁড়াতে পারেন, তাহলে 'ইশার সালাতের ইমাম যখন চতুর্থ রাকআতের জন্য দাঁড়াবে, তখন আপনি ইমামের সাথে না দাঁড়িয়ে তাশাহুদ, দুরূদ ইত্যাদি পড়ে মাগরিবের সালাতের সালাম ফিরাবেন। অতঃপর আপনি 'ইশার বাকী সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিবেন এবং 'ইশার সালাত ইমামের সাথে যতটুকু পাবেন, ততটুকুই পড়বেন। অতঃপর ইমামের সালামের পরে 'ইশার বাকী সালাত পূর্ণ করবেন। আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে, আপনার তিন রাকআত হলে তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ে বসে থাকবেন। অতঃপর সবার সাথে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর আপনি একাকী 'ইশার সালাত আদায় করবেন। কারো কারো মতে আপনি 'ইশার ইমামের পিছনে 'ইশার সালাতের নিয়তেই দাঁড়াবেন। অতঃপর 'ইশার জামা'আত শেষ হয়ে গেলে

আপনি একাকী মাগরিবের সালাত আদায় করবেন। **প্রাধান্য মত :** এ ক্ষেত্রে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করছি। মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। *(ফাতাওয়া বিন বায- ফাতাওয়া নং- ১৮৯/১২ এবং لقاءات الباب المفتوح ٤٥/٣)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমরা জানি যে, ওযূর ফরয ৪টি। কিন্তু কুলি করা, নাকে পানি দেয়া কান মাসেহ করা এগুলো কি সুন্নত। এগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে ওযূ সম্পন্ন হবে কি? *দীন ইসলাম, ঠাকুরগাঁও।*

জবাব : ওযূতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এটা সুন্নাত আবার কারো মতে ওয়াজিব। তবে আলেমদের বিশুদ্ধ মতে ওযূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় কুলি না করলে ও নাকে পানি না দিলে ওযূ হবে না। কেননা আল্লাহ ওযূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া মুখমণ্ডল ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত। *(শারহুল মুমতি- ১/১১৯)*

জিজ্ঞাসা (১০) : ঈদুল আযহায় কুরবানী করার হুকুম কি? দয়া করে জানাবেন। *ফরহাদ, পাকশি, পাবনা।*

জবাব : সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ঈদুল আযহায় কুরবানী করা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। হানাফী মাযহাবেই কেবল কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়ার ফাতাওয়া রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইমাম কুরবানী করা ওয়াজিব বলেননি। তাই আমরা বলবো যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা সুন্নাত ও উত্তম। কেননা নবী (ﷺ) প্রত্যেক বছরই মদীনাতে কুরবানী করেছেন।

জিজ্ঞাসা (১১) : ইদানিং আমরা কিছু কিছু আলেমের কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি যে, ভাগে কুরবানী দেওয়াটা সফরের সাথে খাস। বিষয়টি নিয়ে আমি বিড়ম্বনায় আছি। দয়া করে জানাবেন তাদের বক্তব্য ঠিক কি না? *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : একথা সর্বজনবিদিত যে, একাকী কুরবানী দেয়াই উত্তম। তবে উট ও গরুতে শরীক হওয়া নবী (ﷺ)-এর একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী দ্বারা সুপ্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কে নবী (ﷺ)-এর কতিপয় হাদীস ও সালাফে সালেহীনের বাণী পেশ করা হলো–

(১) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা গরুতে সাতজন ও উটে দশজন করে শরীক হলাম। *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৫০১)*

(২) জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে 'উমরাহ্ দ্বারা উপকৃত হতাম। তখন আমরা একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম, এভাবে আমরা তাতে শরীক হতাম। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৮)*

(৩) জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হুদায়বিয়ার বছর উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরুও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩১৮)*

উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কুরবানীতে শরীক হওয়া সফরের সাথে খাস। কারণ উপরের হাদীসগুলোতে সফরের কথা এসেছে। আলেমগণের মতে, উক্ত বর্ণনাগুলোতে সফরের কথা থাকলেও সেখানে একথা আসেনি যে, উক্ত শরীক কুরবানী সফরের সাথেই খাস ও মুকীম অবস্থায় চলবে না। কারণ–

(১) মুহাদ্দিসীনে কিরামের অনেকেই উক্ত হাদীসগুলো সাধারণভাবে কুরবানীর অধ্যায়ে এনেছেন। কিন্তু তাঁরা বিষয়টিকে সফরের সাথে খাস করেননি। এ থেকেও বুঝা যায় যে, তারা ঐসব হাদীসকে এমনি সফর বা হজ্জের সফরের সাথে খাস হওয়া মনে করেননি। **(২)** হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণও এসব হাদীসকে সফরের সাথে খাস করেননি। আল্লামা আযীমাবাদী, শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, শাইখ ওবায়দুল্লাহ রহমানী তাঁরা কেউ-ই উক্ত কুরবানীতে শরীক সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে সফরের সাথে খাস করেননি। **(৩)** সফরের সাথে শরীক কুরবানীকে খাস করলে যত কিছু নবী (ﷺ) ও সাহাবা কিরাম কর্তৃক সফরে ঘটেছে তার সবগুলোকেই ঐ সফরের সাথে খাস করা দরকার। আর এ অবস্থায় শরিয়তের বহু মাসায়েল 'আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে।

(৪) কুরবানীতে শরীক হওয়া যে সফরের সাথে খাস নয়, তার প্রমাণে আরো অনেক হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। *(সহীহুল জামে' আস্ সগীর- হা. ২৮৯০)*

(৫) ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একটি কুরবানীর গরুতে অথবা উটে সাত পরিবারের সাতজন কিংবা একই পরিবারের সাতজনের অংশ গ্রহণ করা বৈধ। এটাই ইমাম শাফে'য়ী, আহমাদ এবং অধিকাংশ আলেমের মত। এক্ষেত্রে গোশ্তওয়ালার নিয়ত বাকি অংশীদারদের নিয়তের উপর প্রভাবহীন। *(বিস্তারিত : আল-মাজমূ- ৮/৩৭২)*

ভাগে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে সউদী স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে কমিটির সদস্যগণ এই জবাব প্রদান করেছেন : কুরবানীতে একটি গরু বা একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এই সাতজন লোক একই পরিবারভুক্ত হোক অথবা আলাদা আলাদা সাত পরিবারের লোক হোক।

চাই এই সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক। কেননা নবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে একাধিক লোক মিলে উট বা গরু কুরবানী দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে কি না এমন কোনো কথা বলেননি।

জিজ্ঞাসা (১২) : ঘরে হিরা বা ডাইমন্ডের অলংকার থাকলে তার মূল্যমান অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে কি? *আব্দুল করীম নাটোর।*

জবাব : অধিকাংশ আলেমের মতে ডাইমন্ড, হিরা, মনি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথরের তৈরি অলংকারে কোনো যাকাত নেই। বিশেষ করে যখন এগুলো ব্যবহার করার জন্য সংগ্রহ করা হবে। তবে যারা এগুলোর ব্যবসা করে, তাদের এসব পণ্যের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে ২.৫০% যাকাত দিতে হবে। *(দেখুন : ফাতাওয়ায় যাকাত- পৃ. ৯৭; আল-মুদাও-ওয়ানা- ১/৩৪১)*

জিজ্ঞাসা (১৩) : মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করার নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি আছে কি? দয়া করে জানাবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব : জ্বী ভাই, মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করার অনেকগুলো আদব ও পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো রক্ষা করে দু'আ করলে দু'আ কবুলের প্রবল আশা করা যায়। যথা- **(১)** দু'আর শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করবে এবং নবী (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। এমনিভাবে দু'আ শেষেও সূচনার মতোই মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করবে এবং নবী (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। **(২)** দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে এবং মহান আল্লাহর কাছে দু'আ কবুলের দৃঢ় আশা রাখবে। **(৩)** এক দু'আ বার বার করবে এবং তাড়াহুড়া করবে না। **(৪)** স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় দু'আ করবে। **(৫)** নীচু আওয়াজে দু'আ করবে এবং নিরব ও উঁচু আওয়াজের মাঝামাঝি আওয়াজে দু'আ করবে। **(৬)** পাপ স্বীকার করে তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। **(৭)** বিনয়-নম্রতা, দু'আ কবুলের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরে ভয় নিয়ে দু'আ করবে। **(৮)** বান্দার হক্ব নষ্ট করে থাকলে, তা ফেরত দিয়ে দু'আ করবে। **(৯)** কিবলামুখী হয়ে দু'আ করবে। **(১০)** দুই হাত উত্তোলন করে দু'আ করবে। **(১১)** সম্ভব হলে দু'আ করার পূর্বে ওযূ করবে। **(১২)** প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করবে। অতঃপর অন্যের জন্য এই বলে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং অমুককে ক্ষমা করো। **(১৩)** আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ, সুউচ্চ গুণাবলী এবং দু'আকারী যেসব সৎ 'আমল করেছে তার ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করবে। জীবিত উপস্থিত কোনো সৎ লোকের দু'আর ওয়াসীলা দিয়েও দু'আ করতে পারে। **(১৪)** দু'আকারীর পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হালাল রুজি থেকে হতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৪) : বিয়ের ওয়ালীমাহ্ করার উত্তম সময় কোন্‌টি? কতদিন পর্যন্ত ওয়ালীমাহ্ করা যেতে পারে? দয়া করে জানাবেন। *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

জবাব : বিয়ের আনুষ্ঠানিতা সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়ালীমাহ্ করার সময় শুরু হয়। বাসর করার আগে অথবা পরে ওয়ালীমার আয়োজন করা যেতে পারে। কেননা নবী (ﷺ) ওয়ালীমার সময় নির্ধারণ করে দেননি। তাই এতে সময়গত প্রশস্ততা রয়েছে। তবে বাসর করার পর ওয়ালীমাহ্ করাই উত্তম। কেননা নবী (ﷺ) যাইনাব বিনতু জাহাশের সাথে বাসর করার পর ওয়ালীমাহ্ করেছেন। *(দেখুন : সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪২৮)*

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ওয়ালীমার সময় নিয়ে সালাফগণ মতভেদ করেছেন। এটা কি বিবাহের আক্দ-এর সময় না কি আক্দ-এর পর, না কি বাসর করার পর, না-কি আক্দ-এর সময় থেকে বাসর করার সময় পর্যন্ত? *(দেখুন : ফাতহুল বারী- ৯/২৩০)*

আর ওয়ালীমাহ্ করার সময়সীমা সম্পর্কে কথা হচ্ছে, মাত্র একদিন ওয়ালীমাহ্ করা সুন্নাত। তবে কেউ যদি একদিনের চেয়ে বেশি করতে চায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে সাতদিন পর্যন্ত ওয়ালীমাহ্ করা মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এই মতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এই মর্মে তিনি সহীহুল বুখারীতে একটি অধ্যায় রচনা করতে গিয়ে বলেন,

بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ.

"ওয়ালীমাহ্ ও দাওয়াত কবুল করা সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি সাতদিন বা এর কম বেশি সময় ওয়ালীমাহ্ করলো"– *(সহীহুল বুখারী- ৭/২৪)*। তবে এতে অপচয় করা বৈধ নয়।

জিজ্ঞাসা (১৫) : কোনো মুক্তাদী যদি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায় এবং তাতে ইমামের সাথে সালাতে প্রবেশ করে সে কি সেই রাকআত পুনরায় পড়বে না কি রুকূ' পাওয়া গেলেই রাকআত গণ্য হয়ে যাবে? দয়া করে দলীলসহ জানাবেন? *আরিফ, উত্তরা, ঢাকা।*

জবাব : কোনো লোক যদি মসজিদে গিয়ে ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায়, তাহলে সে ইমামের সাথে রুকূ'তে যোগদান করবে। তার এই রুকূ'টাকে রাকআত হিসেবে গণ্য হবে কি না, এই ব্যাপারে আলেমদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, এটাই তার জন্য রাকআত

হিসেবে গণ্য হবে। ইমামের সালামের পর তাকে এই রাকআতটি আর পড়তে হবে না। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে এটাকে রাকআত গণ্য করা যাবে না; বরং এই রাকআতটি পুনরায় পড়তে হবে। আল্লামা বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রুকূ' পাওয়া গেলে রাকআত পাওয়াটাই আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য। কেননা সহীহুল বুখারীতে আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ বিষয়ে মারফূ' হাদীস রয়েছে। আবূ বক্র একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে রুকূ'তে শরীক হয়ে সালাত সমাপ্ত করলেন। তিনি তাকে সেই রাকআত পুনরায় পড়ার আদেশ দেননি– *(দেখুন : সহীহুল বুখারী- হা. ৭৮৩)*। সেই রাকআত যদি পুনরায় পড়া আবশ্যক হতো, তাহলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তাকে তা পুনরায় পড়ার আদেশ দিতেন।

উল্লেখ্য যে, অকিাংশ আলেমের মতের পক্ষে আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ্, দারাকুতনী এবং বায়হাক্বীতেও আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' হাদীস রয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا، وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

"তোমরা যখন সালাতে এসে আমাদেরকে সিজদায় পাবে, তখন তোমরা সিজদা করবে, তবে এটাকে তোমরা রাকআত গণ্য করবে না। আর যে ব্যক্তি রাকআত (রুকূ') পেয়ে যাবে, সে সালাত পেয়ে যাবে।" *(আবূ দাউদ- ৮৯৩, হাসান)*

অত্র হাদীসে যদিও রাকআত পাওয়ার কথা এসেছে, কিন্তু রাকআত অর্থ হবে রুকূ'। কেননা যখন রাকআত শব্দটি সিজদার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়, তখন এর দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য হয়। আর ইবনু খুজাইমাহ্তে সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ আছে যে,

«قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ».

অর্থাৎ- ইমাম সাহেব পিঠ সোজা করার আগে যদি কেউ ইমামের সাথে যোগদান করতে পারে, তাহলে সে রাকআত পেয়ে যাবে"– *(ইবনু খুযাইমাহ্- ১৫৯৫)*। অতএব এ বিষয়ে জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতটিই প্রাধাণ্যযোগ্য।

জিজ্ঞাসা (১৬) : মুসলিমদের জন্য ঘরে অবস্থান করে রেডিও-টিভির প্রচারিত নামাযের ইক্তেদা করা কি জায়িয?

ফাতেমা, গাইবান্ধা।

জবাব : টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত নামাযে ইমামের অনুসরণ করা মুসলিমদের জন্য জায়িয নয়। কেননা জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের জন্য মুসলিমদের একস্থানে সমবেত হওয়া উদ্দেশ্য। অতএব জামা'আত একস্থানে হওয়া জরুরি এবং কাতারগুলো পরস্পর মিলিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং রেডিও-টিভির মাধ্যমে নামায আদায় করা জায়িয হবে না। কেননা তা দ্বারা জামা'আতের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। অতএব মহিলা বা অন্য কারো জন্য রেডিও বা টেলিভিশনের অনুসরণ করে নামায আদায় করা জায়িয নয়। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাওফীক্ব দিন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১৭) : আমি শুনেছি মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করলে তার জান বের হওয়া সহজ হয়। এই মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ কি না দয়া করে জানাবেন।

নূরে আলম, চট্টগ্রাম।

জবাব : সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ-এর তালকীন দিতে বলেছেন। অর্থাৎ- সম্ভব হলে তাকে জোর না করে নরমভাবে এটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। যাতে সে নিজে মৃত্যুর সময় এটা পাঠ করতে পারে। এছাড়া অন্য কিছু পাঠ করানোর কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। আর সূরা ইয়া-সীন পাঠ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এটাকে য'ঈফ বলেছেন। *(দেখুন : মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহক্বীক্ব : আলবানী, হা. ১৬২২)*

জিজ্ঞাসা (১৮) : একই শহরে বা গ্রামে একাধিক ঈদের নামায অনুষ্ঠিত করার হুকুম কি?

মুসা আব্দুল্লাহ
মালদ্বীপ প্রবাসী।

জবাব : প্রয়োজন সাপেক্ষে একই শহরে একাধিক ঈদের জামা'আত হতে অসুবিধা নেই। যেমন- প্রয়োজন দেখা দিলে জুমু'আর নামায একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত করা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"দ্বীনের মাঝে আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো অসুবিধা রাখেননি।" *(সূরা আল হাজ্জ : ৭৮)*

আমরা যদি একাধিক স্থানে নামায অনুষ্ঠিত করা না জায়িয বলি তাহলে কিছু মানুষ জুমু'আহ্ ও ঈদের নামায থেকে বঞ্চিত হবে। প্রয়োজনবশত একাধিক স্থানে ঈদের নামায চালু করার উদাহরণ হলো যেমন শহর প্রশস্ত। তাই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে লোকদের সমবেত হওয়া কষ্টকর। কিন্তু এ ধরনের কোনো অসুবিধা না থাকলে একাধিক স্থানের বদলে একস্থানেই জুমু'আহ্ বা ঈদের নামাযের আয়োজন করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৯) : ঈদের নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব মাইকের মাধ্যমে তাকবীর দেন। মুসল্লিরাও তার সাথে দলবদ্ধভাবে তাকবীর প্রদান করে। এর হুকুম কী?

ফজলে রাব্বি, সাভার, ঢাকা।

জবাব : প্রশ্নকারী তাকবীর পাঠ করার যে পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, তা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়নি। সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে আলাদাভাবে তাকবীর পাঠ করবে। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

নবীজির স্মৃতি বিজড়িত মাসজিদে নামিরাহ্

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

আরবি দশম হিজরি সনে বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। দশম হিজরির জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে প্রায় লক্ষাধিক সাহাবির সামনে নবীজি (ﷺ) যে হৃদয় বিগলিত বক্তব্য পেশ করেন তা বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসাবে পরিচিত। যে তিনটি স্থানে মহানবী (ﷺ) বিদায় হজ্জের এই ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো মাসজিদে নামিরাহ্। এখনো প্রতিবছর এই মসজিদ থেকেই আরাফাতের দিন হজ্জের খুত্বাহ্ পড়া হয়। হজ্জের এই খুত্বায় সমসাময়িক বিষয়ে দিকনির্দেশনার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়। ভ্রাতৃত্ব, মুসলিম ঐক্য এবং নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জানমাল ও ইজ্জত রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষের ঈমান, 'আমল ও মুক্তির পথ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মচর্চার তাগিদ দেয়া হয়। খুত্বাহ্ শেষে যোহরের আযান হয়। একই আযানে দুই ইকামতে যোহর ও 'আসরের ক্বসর দুই রাকআত যোহর ও দুই রাকআত 'আসর নামায আদায় করতে হয়। শুধু হজ্জ মৌসুমে এই মসজিদটিতে এইভাবে ক্বসর করে দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হয়। হজ্জের সময় বাদে বছরের অন্য সময় এ এলাকায় মানুষজন খুব একটা থাকে না। তাই মসজিদটি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। এই সেই মাসজিদে নামিরাহ্ যার জমিন থেকেই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে হজ্জের নিয়মকানুন শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় বিদায় হজ্জের সময় এখানেই রাসূল (ﷺ)-এর তাবু স্থাপন করা হয়েছিলো। ঠিক সেই জায়গাতেই হিজরি দ্বিতীয় শতকে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। প্রচলিত আছে মসজিদের পশ্চিম পাশে ছোট্ট একটি পাহাড় রয়েছে, যার নাম নামিরাহ্। এই পাহাড়ের নামানুসারেই মাসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে মাসজিদে নামিরাহ্। মাসজিদের বর্তমান নান্দনিক রূপটি গ্রহণ করেছে সাম্প্রতিককালের সৌদি শাসনামলে। মসজিদটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এর আয়তন ১ লাখ ১০ হাজার বর্গমিটার। এখানে একত্রে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মুসল্লি নামায আদায় করতে পারেন। মসজিদটিতে ৬০ মিটার উঁচু ছয়টি মিনার রয়েছে। এ মিনারগুলো অনেক দূর থেকে দেখা যায় এবং তিনটি গম্বুজ ও ১০টি প্রধান দরজা রয়েছে। এটি বিশ্বের সুন্দরতম বৃহৎ মসজিদের মধ্যে অন্যতম। এর অবস্থান পবিত্র মক্কার ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আরাফার ময়দানের পশ্চিম সীমান্তে। মসজিদের পাশে একটি রাজকীয় প্রাসাদ রয়েছে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস উলামায়ে কিরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান!** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।